সবার সাথে

শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

বরেন্দ্র লাইব্রেরী
২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

সোজা তো পায়ে গোদ। তার উপরে আছে নানান ছাঁদের চর্ম্ম-রোগের অলঙ্কার।

সত্যই এক আলাদা জগৎ। ঊর্দ্ধে অনন্ত নীলাকাশ—নীচে জীবধাত্রী বসুন্ধরা।

'ভ্যানগার্ডের আপিসের সম্মুখস্থ ফুটপাথের ছোট্ট বাহিনীটির সঙ্গেই আমাদের সবিশেষ পরিচয়।

শ্রীমতী ক। বয়স, অনুমান, পঞ্চাশের ওপারে। ভিখারী সমাজে সে-ই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা স্থূলাঙ্গী। কাঁচাপাকা জট-বাঁধা চুল। তেলচিটে পাজামার উপর ফুটাফাটা রঙ-বেরঙের জামার বহর। গোদা পায়েও নিত্য নূতন ছেঁড়া জুতার আমদানি। হাতে একখানি সরু লাঠি। পেটের চিন্তা মিটিলেই সে তুষ্ট নয়। আমাদের প্রসাধনপটিয়সী শ্রীমতী ক'র 'পর রুচি পরনা' কথাটা ভাল করিয়াই জানা ছিল।

ভিক্ষা চাহিত সে ভিখারীর মত নয়। শিয়ালদহের মোড়ে ট্রাম ও বাসের ষ্টপেজে দাঁড়াইয়া যাত্রীদের কাছে সে জোর গলায় দাবী জানাইত। তাহার ভাঙ্গা-ভাঙ্গা বাঙ্গলা বুলির আদেশ অমান্য করিয়া যাত্রী-বোঝাই বাস যথাসময় ষ্টার্ট দিত। সেও অমনি হাতের সরু লাঠি-গাছ দিয়া মন্থরগতি হাওয়াগাড়ীর বুকে পিঠে সশব্দে জানাইত তার সক্রোধ প্রতিবাদ।

সারাদিনের খাটুনির পরে সে চলিত গজেন্দ্র-গমনে—তাহার পথের আবাসে। রাস্তার পাশের বিড়ির দোকানগুলির মাত্রাহীন রসিকতার পাল্টা জবাবে সে লাঠি উঁচাইত দূর হইতে। আবার উৎপাত! ছকু খানসামা লেনের মোড়ে এক দল দুষ্ট ছেলের অঙ্গভঙ্গির উত্তরে সে দন্ত

বিহীন মুখ বিড় বিড় করিয়া, ভ্যাঙচাইয়া, শাসাইয়া, অপরূপ রসভঙ্গের সৃষ্টি করিত।

এই শ্রীমতী ক'র আশ্রিত পুত্র ছিল শ্রীমান্ ঙ। বয়সের হিসাবে ঙ'কে যুবকই বলিতে হইবে। শ্রীমতী ছিল যেমনি মোটা শ্রীমান্ তেমনি রোগা। ডান পায়ে একটু গলদ আছে, খোঁড়াইয়া হাঁটে। প্রায়ই দেখিতাম সে নিশ্চিন্তে শুইয়া আছে—ঘুমের কুম্ভকর্ণ যেন। খাবার বেলায়ও ছিল তেমনি এক বৃকোদর। শরীরের অভ্যন্তরে এত অধিক ভোজ্য বস্তু কেমন করিয়া স্থান পাইত—সে রহস্য ভাবিয়া দেখিবার মত।

বলা বাহুল্য, সংবাদপত্র আপিসে কাজ করিলেও এত খবর সংগ্রহ করা একা আমার দ্বারা সম্ভব হয় নাই। আমাদের আপিসের বেয়ারা রঘুনাথের মুখে শুনিয়াই এত কথা জানি। রঘুর নিকটই শুনিয়াছি, শ্রীমান্ ঙ প্রায় শুইয়াই কাটায়, কালেভদ্রে ভিক্ষায় বাহির হয়। শ্রীমতী ক'র অর্জ্জিত অংশে সুতরাং দু'বেলাই ভাগাভাগি হয়। বুড়ীর সঙ্গে এই বিকলাঙ্গ ছেলেটার কোন রক্তের সম্বন্ধ ছিল না। ধর্ম্মমায়ের স্নেহের সুযোগ লইয়া সে জামাইয়ের মত কেবল বসিয়া বসিয়া খায়। ইহা লইয়া মাঝে মাঝে কলহ না হয় এমনও নয়। কিন্তু দুদিন ভিক্ষায় বাহির হইলে তিন দিনের দিন শ্রীমতী ক কি জানি কেন শ্রীমান্‌কে আর বাহিরে যাইতে দিত না। এমনি করিয়া তাহারা বছর খানেক হইল 'ভ্যানগার্ড' আপিসের সম্মুখের ফুটপাতে রীতিমত এক মৌরুসী পাট্টা করিয়া লইয়াছে।

তাহাদের সংসারযাত্রার ইতিহাসে আমার এই উদ্ভট কৌতূহল দেখিয়া সহকর্ম্মীরা হাসিত। অগত্যা আমি মাঝে মাঝে সময় করিয়া বারান্দায় আসিয়া রঘুনাথের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিতাম নিরালায়।

আমার কৌতূহলে রঘুনাথও বুঝি মনে মনে হাসিত। তবে ওদের কথা আমার কাছে রসান দিয়া বলিতে রঘু বেশ আনন্দ পাইত বুঝিতাম। যাহা হউক, সংবাদপত্র আপিসের বেয়ারা রঘু ছিল ঐ সর্ব্বহারা সমাজের সাংবাদিক আর আমি ছিলাম তার এক তথ্যজিজ্ঞাসু গ্রাহক।

আমাদের আপিসের সম্মুখের এই আস্তাকুড়েও একদিন কেমন করিয়া ফুল ফুটিল। শ্রীমান্ ঙ প্রেমে পড়িয়াছে। কলেজ ষ্ট্রীটের এলাকা হইতে এক ভিন্ দেশী বধূ এ দেশে আসিয়াছে। নীড় বাঁধিল ত বাঁধিল একেবারে শ্রীমতী ক'দের সীমানারই গায়! আগেকার সাঙ্গাতের উপর গোঁসা করিয়া কোলের ছেলে লইয়া সে ঘরের বাহির হইয়া আসিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গেই আর এক গৃহহীনের গৃহিণী হইবার সুযোগও জুটিয়াছে। শ্রীমান্ ঙ হইয়াছে তাহার দ্বিতীয়তম। শ্রীমানের কিন্তু এই প্রথমা। এত সব কথা আমার রঘুর কাছেই হইতে শোনা। আসল ঘটনার সঙ্গে সে কতখানি ভেজাল মিশাইয়াছে তাহা আমার সঠিক জানিবার প্রয়োজন নাই।

শ্রীমতী ক সারাদিন প্রায় বাহিরেই কাটায়। রাত্রেও তাহার নিশ্ছিদ্র নিদ্রা। সুতরাং এতদিন সে কিছুই টের পায় নাই। গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিয়া দিয়াছে শ্রীমান্ ঙ'রই এক প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বী। সে থাকিত ও পাড়ায়—হায়াত খাঁ লেন যেখানে হ্যারিসন রোডে পড়িয়াছে। তার এ অঞ্চলে আবির্ভাব ইদানীং।

সকল কথা জানিয়া শ্রীমতী ক রণচণ্ডী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। শুধু মুখে মুখেই নয়, মৃদুমন্দ হাতাহাতিও হইয়া গেল। শ্রীমতীর রাগ হওয়াটা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। গত পনর দিন ধরিয়া হঠাৎ শ্রীমান্ ঙ'র খোরাক

বাড়িয়া গিয়াছিল। সেই অছিলায় ধর্ম্মমায়ের নিকট হইতে বেশী বেশী খাবার আদায় করিয়া গোপনে গোপনে সে যে এতদিন কাহার সহিত ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে, তাহা এখন আর জানিতে বাকী নাই।

আপিসে ঢুকিবার মুখে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া তুই পক্ষের খণ্ড প্রলয় দেখিলাম। আমাদের বিকটভুঁড়ি দারোয়ানজীর ভয়ে তর্জ্জন-গর্জ্জন অবশ্য সপ্তমে চড়িতে পারিতেছে না—চাপাচাপা ধারাল শাসাল বাক্য-বর্ষণের প্রবল প্রতিযোগিতা।

ও ইতিমধ্যে ধর্ম্মমায়ের সঙ্গে ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। তাহার সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি লইয়া প্রেমিকার কাছে বাসা বদল করিয়াছে একটু দূরেই

ও-দিক হইতে শ্রীমতী করে টগবগ, এদিক হইতে শ্রীমান্ করে তিড়বিড়। আর যাহাকে লইয়া এই কুরুক্ষেত্র সে তখন কোলের ছেলে লইয়া আঁচলে মুখ ঢাকা দিয়া শুইয়া আছে পরম নিশ্চিন্তে। শুধু মাঝে মাঝে আবরণ একটুখানি ফাঁক করিয়া মিটমিট করিয়া চাহিয়া যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে মাত্র। কুচকুচে কালো তুখানি পা থাকিয়া থাকিয়া নড়িয়া-চড়িয়া সে যে ঘুমায় নাই, স্বকর্ণে সকলই শুনিতেছে—তাহার প্রমাণ দিতেছে। রঘুনাথের কাছে কাহিনীটা শুনিবার পর হইতে নায়িকাকে ভাল করিয়া দেখিবার বড় ইচ্ছা ছিল। কিন্তু গ্যাসপোষ্টটা ঢাকা পড়িয়াছে নিম-গাছে। আবছায়া আলোতে অমাবস্যা সুন্দরীর একজোড়া তুষ্ট চোখের চাপা হাসি ছাড়া সেদিনের মত আর বিশেষ কিছু দেখিতে পাইলাম না।

নায়ককে তো গত আট মাস ধরিয়া দেখিয়া আসিতেছি।

তবু, এই ঝগড়ার মুখেও, তাহাকে আজ যেন নূতন করিয়া দেখিলাম। ঐ শুকনো মুখখানিতেও আজ কেমন-কেমন ভাব। একটু কি যেন আছে যাহা এতদিন দেখি নাই। আমিও তখন শ্রীমান্ ঙ'র মতই তরুণ যুবক। আমার ঐ বয়সের ভাববিলাসিতার আকাশখানিতে তখন হাজার-রঙা রামধনু। অনুমান করিলাম, মরা গাঙে আজ বান ডাকিয়াছে—তাই না এত দিনের সেই অবহেলিত ঙ'ও আজ আমার চোখে এত সুন্দর ঠেকে। প্রেমের আর যত বাছবিচারই থাকুক,—জাত্যভিমান নাই। পঞ্চশরের চোখে মুড়ি-মিছরির এক দর!

ঝগড়া থামে নাই। উভয় পক্ষেই যেন তপ্ত খোলায় খৈ ফুটিল অশুন্তি—অনর্গল—অকথ্য। মনে মনে বিবদমান দুই পক্ষের কোন দিকেই যোগ দিতে পারিলাম না। আমি আলাদা জগতের লোক—ওদের নিয়ম-কানুন বৈধতা-অবৈধতার আমি কি জানি! তবু শ্রীমান্ ঙ'র প্রথম প্রেমে সায় না দিয়া পারি না। আবার শ্রীমতী ক'র প্রতিও সমবেদনা জাগে। তাহার এতকালের একচেটে স্নেহের অধিকারে বাহির হইতে দুদিনের এক ছুঁড়ি আসিয়া জুড়িয়া বসিলে সে-ই বা কেমন করিয়া তাহা সহ্য করে!

হিন্দী বাত জানা ছিল না। সুতরাং শুধু বচসাই শুনিলাম—বুলি বুঝিলাম না। বুঝিলে বিপদে পড়িতাম। ভাষা-সুন্দরীর বিবস্ত্র দশা দাড়াইয়া দেখিতে পারিতাম না নিশ্চয়ই।

হাসিতে হাসিতে আপিসে গেলাম—বুঝিলাম, গোবরেও পদ্ম ফোটে। স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা কেবল উঁচু ডাঙারই একচেটে সম্পত্তি নয়—

পাঁকের তলেও বীজের অভাব নাই। আপাততঃ অতশত ভাবিবার সময় ছিল না—সম্মুখে কাজের তাড়া। দশ মিনিট লেট হইয়া গিয়াছি।

সেদিন রাত্রে বাসায় ফিরি নাই। তিনজন অভ্যাগতের আকস্মিক আগমনে বাসায় স্থানাভাব। বাকী রাতটুকু আপিসে কাটাইলাম। ঘুম ভাঙ্গিল সকাল সাড়ে ছ'টায়।

বাহিরে আসিয়া দেখি, পূর্ব্ব রাত্রের নায়িকা এখন জাগিয়া বসিয়া আছে। পরণে তেলকাষ্টে একখানি লাল পেড়ে শাড়ী। রুক্ষুসূক্ষু একপিঠ এলোচুল। চোখদুটি খাসা। কালো মুখে ঝকঝক করে দু'পাটি দাঁত। আবলুস হইলেও সে শ্রীহীন কালো নয়। আমার চোখেই যখন ভাল লাগিয়াছে, ভিখারী সমাজে কবি থাকিলে ওকে কৃষ্ণকলি বলিয়াই ডাকিবে।

রোদের দিকে মুখ করিয়া মা তার ছেলেটাকে মাই দিতেছে। জননীর এক হাতের নিবিড় বেষ্টনে কচি ভিখারী-শিশু চুকচুক করিয়া স্তন্য পান করিতেছে, আর এক হাতও ছেলেরই উপর—শিশুর হাতপায়ের ময়লা খুটিতেছে আনমনা হইয়া। শিয়ালদহ নর্থ ষ্টেশনের উত্তুঙ্গ নিষেধ ডিঙাইয়া সকাল বেলার খানিকটা কাঁচা রোদ মা-ছেলের মুখে চোখে আসিয়া যেন পিছলাইয়া পড়িয়াছে। খানিক দাঁড়াইয়া মজা দেখিলাম। আমার ম্যাডোনা মাঝে মাঝে সন্তানের মুখ হইতে স্তন কাড়িয়া নিয়া, কাঁদাইয়া, পরক্ষণেই আবার ফিরাইয়া দিয়া আত্মজের সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া কৌতুক খেলায় মাতিয়াছে চমৎকার! লজ্জার বালাই নাই। সহজ, সরল! ঐ হাস্যময়ী যশোদামূর্ত্তি সেদিনের রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাতখানিরই এক দোসর যেন।

পরদিন রাত্রে আবার দেখিলাম নব দম্পতিকে। দম্পতি বলায় বোধ হয় ভুল হইল না। আমাদের উঁচু ডাঙ্গার বিধিনিষেধের শতেক খুঁটিনাটি ও জগতে খাটিবে কেন!

শ্রীমান্ ঙ সারাদিনের পরে ভিক্ষা করিয়া বাসায় ফিরিয়াছে। যে-লোক অপরের ঘাড়ে বসিয়া খাইত, দৈবাৎ কোন দিন ভিক্ষায় বাহির হইলে বিশেষ কিছু জুটাইতেও পারিত না, সে আজ তিন-তিনটী প্রাণীর আহার্য্য লইয়া আসিয়াছে। তাহার অসহায় মুখখানিতেও আজ খুসীর হাসি। আমিও খুসী হইলাম। শ্রীমানের এতদিনে কর্ত্তব্য বোধ জাগিয়াছে। তার প্রেম তবে দায়িত্ব-বিমুখ নয়। সংসার করিবার স্পর্দ্ধা এই নিরুপায় অর্দ্ধ-খোঁড়ারও আছে!

আমার সকালের ম্যাডোনার কিন্তু আর এক রূপ দেখিলাম। বেলা-বাঁ হাতে ঘুমন্ত ছেলে কোলে আঁকড়াইয়া রাখিয়াছে, আর ডানদিকে আধ-শোওয়া নূতন সাঙ্গাতের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বুঝি বা প্রেমালাপেই ব্যস্ত। ডাহিনে কাঙ্ক্ষিত পুরুষ, বাঁ দিকে কোলের সন্তান। দ্বিধাবিভক্ত অখণ্ড নারী! খানিক দূরে ঙ'র প্রাক্তন প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বার কয়েক অবজ্ঞাভরে কটাক্ষপাত করিল। একবার আমার দিকেও চাহিয়াই হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। ভিখারী-রাজ্যে সে যে এক সুদুর্ল্লভ বস্তু—সেই বিষয়ে মেয়েটি অতিমাত্রায় সচেতন। ইচ্ছা হইল, গোটা চারেক পয়সা ফেলিয়া দিই। বেলফুলের মালা কিনিয়া ঐ আবরুহীন নিরাভরণ দেহে আপাদশির সে ছন্দিত হইয়া উঠুক।

কবিত্ব ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছি। শ্রীমতী ক. ডাকিল, "অ—বাবু!"

ফিরিয়া দাঁড়াইলাম।

"তোমি তো ভদ্রো লোক আছে।—কহিয়ে না।"

কি কহিব বুঝিতে না পারিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম

তাহার হিন্দী-বাংলার খিচুড়ি কথার মর্ম্মার্থ এই : এতকাল ছেলেটিকে বুড়ীই খাওইয়া মানুষ করিয়াছে, আর আজ হইল ঐ বেটিই বড়।

আমিও ন্যায় যোগে হিন্দী চ' সূত্রের সাহায্যে বুঝাইলাম—তাহার ছেলে এখন বড় হইয়াছে, সাদির দরকার। ঐ বেটিও দেখিতে মন্দ নয়..

বুড়ী খেঁকাইয়া উঠিল—মাগীর মুখে আগুন—ও মরুক্। পরক্ষণেই গলা খাটো করিয়া আমাকে তাহার গোপন অভিপ্রায় জানাইল, রাত্রিবেলা ঘুমের মধ্যে সে হারামজাদীর মাথার খুলি খুলিয়া ফেলিবে।

হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলাম।

তারপর তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে। তাহাদের ঘরোয়া খবরে আমার আগ্রহও অনেকখানি শিথিল হইয়া আসিয়াছে। শুধু মাঝে মাঝে আপিসের গেটে ঢুকিবার সময় চোখে পড়িত—অভিমানিনী শ্রীমতী ক পৃথগন্নই আছে। শ্রীমান ঙ ও তস্য প্রিয়া উভয়েই ঘরে-বাইরে রোজগার করে। শ্রীমান ছুতা পাইলেই মাঝে মাঝে আগেকার নির্ব্বিকার স্বভাবে ফিরিয়া আসিতে চায়। তাহা লইয়া এক একদিন দুই জনে তুমুল কোঁদল বাধে। ইতিমধ্যে তিনবার বহু আড়ম্বর করিয়া ছাড়াছাড়ি

হইয়া দু'দণ্ড বাদেই আবার লঘু ক্রিয়ায় আসিয়া আপোষ রফা হইয়াছে। আছে বেশ! রুটি, বেটি আর মাটি—তিনটিই শ্রীমানের করায়ত্ত: খাঁটি সংসার।

কোন কোন দিন দেখিতাম, কৃষ্ণকলি দু'চারটি পাড়াপড়শী মেয়েকে ডাকিয়া আনিয়া গল্প করিতেছে; শ্রীমান্ বাহিরে। ছেলেটা ঘুমে। সময় বুঝি আর কাটিতে চায় না। তাই এই মুখর আসর। তাহাদের আলাপ-আলোচনার ঠাটঠমক দেখিয়া আন্দাজ করিতাম, যার যার ঘরের "উনি"-ঘটিত কত দিনের কত কাহিনীর রসাল বিনিময় চলিতেছে পরস্পরের মধ্যে। কখনো বা একসঙ্গে খিল খিল করিয়া হাসিয়া ওঠে। পথিকদের দেখিয়া পরক্ষণে আবার চুপ করিতেও জানে। এ ওর গা টিপে, সে তার চুল টানে, একজন আর একজনের ঘামাচি মারে কেহ কাহারো আঁটাল এলোচুলের উকুন বাছিতে বাছিতে কথার মাঝে থামিয়া পড়িয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কানে কানে কয় গোপন কথা। সবার মধ্যে থাকিয়াও কৃষ্ণকলি ছিল যেন এক স্বয়ং-স্বতন্ত্র মধ্যমণি। আমার কেমন ইচ্ছা যাইত সন্দেহ করি—না হয় একটু কল্পনাই করি—কৃষ্ণকলি বুঝি কোন তরুণী শাখার ভ্রষ্টলগ্নের এক অবাঞ্ছিত পূর্ণ ফল, বৃক্ষের মান-মর্য্যাদা বাঁচাইয়া আজ গোত্রহীন পথের প্রান্তে এক অনাদরের উচ্ছিষ্ট!

যাক্ এ-সব নিরপেক্ষ দর্শকের রঙীন অনুমান। এবারে আসল ঘটনাটাই বলি।

সেদিন ইভিনিং সিফ্‌টে কাজ পড়িয়াছে—বিকাল তিনটা থেকে রাত দশটা।

সন্ধ্যাবেলা চা দিতে আসিয়া রঘুনাথ জানাইল, "ভারি মজার খবর বাবু"

"ব্যাপার কি রঘু?"

"কাল বিকেলে সেই ছুঁড়িটা ছেলে নিয়ে চলে গেছে—আর আসবে না।"

"বলিস কি রে!" হাসিয়া উঠিলাম।

"হাঁ। আর আসবে না।"

"কেন?"

"কালীঘাটে না কি এক ভালো সাঙ্গাতের খোঁজ পেয়েছে। তার আয় বেশি—এখানে থাকবে সে কোন্ দুঃখে বাবু! সেই খোঁড়া ছোঁড়াটা সন্ধ্যের পর খাবার নিয়ে ফিরে এসে দ্যাখে, তার কপাল ভেঙ্গেছে। সেই যে কাল রাত্রে না খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েছে আজও সারাদিন বার হয় নি—কিচ্ছু খায়নি। মুখ গুঁজে পড়েই আছে।"

ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিলাম, "মেয়েটা আর আসবে না এত বড় কথাই বলে গেছে?"

"হুঁ।—আর বুড়ি বেটির কা আনন্দ! কাল সারারাত আর আজ সারাদিন ছোঁড়াকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়েও ওর আশ মিটছে না।"

সহকর্মী মৃণালবাবু হাসিয়া কহিলেন, "এ যে পরস্ত্রী নিয়ে রীতিমতো elopement—আইনত ব্যভিচারের চার্জ্জ আনা যেতে পারে! ভূপেশ বাবু, আমাদের কাগজে মেন্ পেজে ভাল জায়গায় টপ্ হেডিং দিয়ে সংবাদটা ছাপিয়ে দিই, কি বলুন?"

হাসিয়া রঘুকে বলিলাম, "যাক্ কালীঘাটে একসঙ্গে ঘরকন্না ও পুণ্যসঞ্চয় দুইই হবে।"

কৃষ্ণ এবার গম্ভীর হইয়া কহিল, "আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, কালীঘাট টালিঘাট কিচ্ছু নয়, বাবু। ছুঁড়ি গ্যাছে সেই নিমগাছের দিকে যে ভিখিরিটা থাকতো না?—তারই সঙ্গে। দু'দিন আগেই না ব্যাটা তল্পি তল্পা নিয়ে সরে পড়েছে। আচ্ছা, ঘোরেল!"

"বুড়িটার খুব আনন্দ হয়েছে, না রে?"

"খুব। দুদিন জ্বরে পড়ে আছে। ভিক্ষায় যেতে পারে নি। তবু তার দাপট ছ্যাখে কে!"

রঘুনাথ চলিয়া গেলে মৃণাল বাবু প্রেমের এক অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা করিয়া মন্তব্য করিলেন—বুদ্ধিমতী কৃষ্ণকলি ঝোপ বুঝিয়াই কোপ মারিয়াছে। কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া কাজে মন দিলাম। বেঙ্গল অ্যাসেম্ব্লিতে সেদিনের ভিক্ষুক নিয়ন্ত্রণ বিলের প্রথম দফার আলোচনার ডবল-কলম সংবাদটার একটা জম্‌কালো হেডিং করিলাম—সি-ডাকে ছাড়িতেই হইবে।

খানিক বাদে বাহিরে আসিলাম। হতাশ প্রেমিককে একবার দেখিবার বড় সাধ। কিন্তু হতাশ হইলাম। শ্রীমান্ স্বস্থানে নাই। বিরহের চেয়েও জঠর বড়। সারাদিন পড়িয়া পড়িয়া ক্ষুধার জ্বালায় এখন রাত্রিবেলা বাহির হইয়াছে কিছু জুটাইবার ফিকিরে। শ্রীমতী ক রহিয়াছে কাঁথা মুড়ি দিয়া। মনে হয় জ্বরে বড় কাবু করিয়াছে। কেন-না উপোস দেওয়ার মত কুঁড়ে সে কোন কালেই নয়, নানা কলা-কৌশল জানে।

চলিয়া যাইব ভাবিতেছি, দেখি শ্রীমান্ একখানি পাউরুটি যোগাড় করিয়া বাসায় ফিরিতেছে। খানিক অপেক্ষা করিতে হইল। একদা

যে-মুখে খুসীর হাসি দেখিয়াছিলাম, আজ সেখানে নৈরাশ্যের ছায়াখানি কেমন লাগে সেটা দেখিতেই হইবে।

রুটিটা নোংরা চাদরের উপর রাখিয়া শ্রীমান্ খানিক চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মুখের ভাব স্থির, নিশ্চল ভঙ্গি। ভীষণভাবে যে একটা কিছু ভাবিতেছে বেশ বোঝা যায়।

ওদিকে শ্রীমতী ক বারে বারে কাঁথা ফাঁক করিয়া রুটিখানি দেখিতেছে। ক্ষুধার জ্বালা বুঝি আর সহ্য হয় না, আবার মানের দায়ে চাহিতেও পারে না। কৃষ্ণকলি নাই বটে; কিন্তু এত কাণ্ডের পর রাতারাতিই আর আপোষ মীমাংসা ঘটিয়া ওঠে না। শ্রীমান্ ঙ'র কিন্তু কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। ঠায় বসিয়া আছে। চারিদিকে এত লোক এত যানবাহন, এত কোলাহল—তবু প্রিয়াহীন ভবনে সে আজ নিঃসঙ্গ, বুঝি বিরহী যক্ষের মতই ব্যাকুল, বিমনা। মনে মনে তাকে একটু সকৌতুক সমবেদনা জানাইলাম।

হঠাৎ সে ভাঙ্গা মগটা লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তেষ্টা পাইয়াছে। কিন্তু এইমাত্রে রাস্তার কলে আর জল নাই। এখন উপায়! সার্কুলার রোডের ঐপারে তাকাইল। ভাগ্য ভাল। রাস্তার ওপারে বগ বগ করিয়া জল উঠিতেছে—রাস্তায় জল-দেওয়ার কলটার মুখের ঢাকনা খোলা, কি একটা ত্রুটি ঘটিয়াছে।

শ্রীমান্ ঙ ফুটপাতের কিনারায় দাঁড়াইয়া চলন্ত যানবাহনের বিকীর্ণ ভীড়ে ওপারে পাড়ি দিবার উদ্দেশ্যে ফাঁকের অবসর খুঁজিতেছিল। শ্রীমতী ক'ও কাঁথার মধ্য হইতে মিটমিট করিয়া তাকাইয়া বুঝিতে চাহিল, শ্রীমান্ ওপারে গেল কিনা।

শ্রীমান্ সহসা কি ভাবিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল। শ্রীমতীও অমনি নির্ব্বিকার—নড়েনা চড়েনা, যেন কত ঘুমই না ঘুমাইতেছে! কিন্তু শ্রীমান্ আজ সেয়ানা হইয়াছে। ভিখারী রাজ্যে সিঁধ কাটিয়াও যখন মানুষ চুরি হয়, আর এ তো সামান্য একখানি রুটি—একদিনের খোরাক শুধু। ছকু খানসামা লেনের সেই লোকটার পরিত্যক্ত স্থানে বৌ-বাজারের এক পাগলা আসিয়া দখল লইয়াছে। একবার তাহাকে দেখিয়া লইল। তারপর রুটিটাকে নোংরা কাপড়ের অর্দ্ধেক দিয়া মুড়িয়া বালিশের মত করিয়া রাখিল। ক্ষুধা বুঝি মরিয়া গিয়াছে। এখন তেষ্টাই বেশী। তাই আগে খানিক জল খাইয়া আসিতে চায়। যাইতে যাইতে বার দুই শ্রীমতীর দিকে তাকাইল। সে যে ঘুমাইয়া আছে সে বিষয়ে তার সন্দেহ নাই। তবু আজ তার সব কিছুতেই কেমন যেন শঙ্কা। সারা দুনিয়া তাহার বিরুদ্ধে যেন চক্রান্ত আঁটিতেছে!

আমি দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছিলাম। শ্রীমান্ ওপারে পৌঁছিবার আগেই তাহার ধর্ম্ম-মা উঠিয়া আসিয়া চাদরের মধ্য হইতে রুটি বাহির করিল। ঘন ঘন ওপারে তাকায়। শ্রীমান্ ফিরিবার আগেই কাজ হাসিল করা চাই। ওঁকে সে কেয়ার করে না বটে; কিন্তু লজ্জা বলিয়া একটা কথা আছে তো! বুড়ী কিন্তু দেখিল না আর একটি ক্ষুধিত জীব—নিমগাছের তলায় সেই পাগলার একজোড়া লোলুপ দৃষ্টিও রুটি-খানির উপর নিবদ্ধ। এক খাবলেই শ্রীমতী রুটির অর্দ্ধেকের বেশী ছিঁড়িয়া লইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া চলিয়াছে এমন সময় আঁজলা ভরিয়া জল খাইতে খাইতে ওপার হইতে শ্রীমানের দৃষ্টি পড়িল এ-পারে। ... ডাক করিয়া

সে উঠিয়া দাঁড়াইল। ঐ খোঁড়া পায়েই যথাসাধ্য ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া রাস্তার মাঝামাঝিও পৌঁছিতে পারিল না—একটা প্রাইভেট মোটর সশব্দে ব্রেক কশিয়া পর মুহূর্ত্তেই উত্তর দিকে ছুট দিল নক্ষত্র বেগে।...... ধর ধর—মার শালাকে......পুলিশ......এখনো মেছুয়া বাজারের মোড়ে পৌঁছয়নি...নম্বর কত... ইত্যাদি তর্জ্জন গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে ট্রাম লাইনের উপর রক্তস্রোত ঘিরিয়া এক অসম্ভব জনতা।

এত লোকের হৈচৈ শুনিয়া বুড়ী রুটি হাতে স্তব্ধের মত দাঁড়াইয়া আছে। শঙ্কাকুল কণ্ঠে আমাকে প্রশ্ন করিল, "ক্যা হুয়া বাবুজি ?"

কোন জবাব না পাইয়া রাস্তার দিকে আগাইয়া গেল। প্রকৃত ব্যাপার বুঝিবার জন্য এখানে ওখানে ভিড়ের মধ্যে একটুখানি ফাঁক খুঁজিতে লাগিল—রুটি খণ্ড কিন্তু হাতের মধ্যে তেমনি শক্ত করিয়া ধরা —খানিকটা মুখের মধ্যে, নিশ্চিন্তে চিবাইতেছিল তখনো !

রুটিখানির বাকী অর্দ্ধাংশও ইতিমধ্যে উধাও। সেই সেয়ানা পাগলটা সুযোগ বুঝিয়া বুড়ীর ভয়ে একেবারে তল্পিতল্পা লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। বুদ্ধিমান !

আপিসের গেটের মধ্যে ঢুকিলাম। রাস্তার কোলাহল ডুবাইয়া দিয়া ভ্যানগার্ডের রোটারিতে তখন ঘণ্টায় পনের হাজার স্পীডে ডি-ডাকের কাগজ ছাপা হইতেছিল—ভিক্ষুক নিয়ন্ত্রণ বিলের সেই লাগ-সই ডবল-কলম হেডিংটাও !

পিঠাপিঠি

মুখুজ্জে-গৃহিনীর পুত্রবধূ মলিনা আসন্নপ্রসবা। চার বছরের কোলের ছেলে বাসু আজ মাসখানেক হইল তার ঠাকুরমার কাছে শোয়।

প্রথম প্রথম সে কিছুতেই মায়ের কাছছাড়া হইতে চাহিত না। কত সাধ্য-সাধনা; নানা খেলেনার প্রলোভন, তবু বাসু কিছুতেই কথা শোনে না। তার প্রধান আপত্তি—ঘুমের মধ্যে ঠাকুমার নাক ডাকে,—ভয় করে তার!

সন্ধ্যারাত্রে বিছানায় মার গলা জড়াইয়া সে কত আবোল-তাবোল বকিতে থাকে। কথায় কথায় মা হঠাৎ হয়ত প্রশ্ন করে "খোকন, আজ তুমি ঠাকুরমার কাছে শোবে, কেমন?

"না-না।"

"না কেন রে!—লক্ষ্মীটি, কথা শোন। ঠাকুরমা তোকে কত ভালবাসেন।"

"ঠাকুরমার নাক ডাকে।"

মলিনা হাসিয়া বলে, "বলে দেব"—তারপর শাশুড়ীকে উদ্দেশ করিয়া বলে, "মা! শোন, বাসু তোমায়—"

খোকা তাহার ছোট ছোট হাত দুটি দিয়া মায়ের মুখ চাপা দিয়া কথা বন্ধ ক'রে।

মলিনা হাসিয়া আবার বলে "তবে বল, আজ তুমি ঠাকুরমার কাছে শোবে।"

"কাল শোব। আজ আমি তোমার কাছেই থাকব মা।" শিশু আবেগে মায়ের কণ্ঠলগ্ন হয়। মাও ছেলেকে বুকে জড়াইয়া ধরে। মুখে তাহার কথা বন্ধ হয়। আর পীড়াপীড়ি করে না সে।

বাসু মা'র কোল ঘেঁষিয়া শুইয়া এ কথা সে-কথা বলিতে বলিতে সহসা কখন জননীর বুকের আঁচল সরায়। মা বাধা দেয়, "ছি খোকন! তুমি না বড় হয়েছ।—সেদিন না বললে, আর খাবে না।"

"না মা, আমি খাব না মা—আমি খাওয়া-খাওয়া খেলা করব।"

শিশুর এই ছলনা মায়ের বুকে বিঁধে। মলিনার মনে পড়ে, স্তন্য ছাড়াইবার প্রতিদিনের ইতিহাস! কত অনুরোধ, কত উপদেশ, তারপর ধমক! মলিনা দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া যায়।

এক এক দিন মলিনা নাছোড়বান্দা বাসুকে হয়ত মাতৃস্তন্যে পুনরধিকার দেয় খানিক ক্ষণের কড়ারে। শাশুড়ীর চোখে পড়িলেই তিনি মৃদু তিরস্কার করেন, "ওকি বৌমা! অমন কাজও ক'রো না। আবার ধরলে ছাড়ানো মুস্কিল হবে।"

মলিনা বাসুকে জোর করিয়া বুক-ছাড়া করে। আসিতেছে যে তার কথা ভুলিলে চলিবে কেন!

"না মা, আমি খাব না। এই দ্যাখ"—বলিয়া লক্ষ্মী ছেলে নিজেই মায়ের বুকের উপর আঁচল টানিয়া দেয়।

তার পর মা-ছেলেতে চলে অশ্রান্ত কথার বিনিময়। একসময় ভাষার উত্তাপ কমিতে থাকে ; অবশেষে চোখের পাতা ভারী হয় ; বাসু কখন ঘুমাইয়া পড়ে। মলিনা উঠিয়া গিয়া খোকাকে শাশুড়ীর বিছানায় রাখিয়া আসে সন্তর্পণে।

মাঝরাত্রে জাগিয়া বসিয়া মা-কে না দেখিয়া বাসু কিন্তু কাঁদিতে থাকে। ঠাকুরমার আদর-অনুনয় কানেও তোলে না।

বাসুর ক্রন্দনে মলিনাকে ও-ঘর হইতে এ-ঘরে আসিতে হয়। কোন কোন দিন নিজের ঘরেও লইয়া যায়, কোন দিন বা ঘুম পাড়াইয়া আবার শাশুড়ীর কাছেই রাখিয়াও নিঃশব্দে সরিয়া পড়ে।

এমনই করিয়া দিনে দিনে বহু চেষ্টায় বাসুর সুমতি হইয়াছে। এখন সে রাত্রে স্বেচ্ছায়ই ঠাকুরমার কাছে শোয়। তবে সন্ধ্যারাতে মায়ের কোলে একটুখানি ঘুমান তাহার না হইলেই নয়।

শেষরাত্রে জাগিয়া সে আজকাল ঠাকুরমার মুখে কৃষ্ণের শতনাম শোনে। প্রশ্ন করে কত কি। কথায় কথায় ঠাকুরমা সুধায়, "বল ত দাদু আমার, তোমার ভাই হবে, না বোন্ হবে ?"

বাসু জবাব দেয় না। ভাই হইবে অনেক দিন সে-কথা শুনিয়া আসিতেছে। কিন্তু চার বছরের শিশু-চিত্ত কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারে না, এই ভাই হওয়ার সঙ্গে মায়ের নিকট হইতে তাহার বিচ্ছেদের সম্বন্ধ কোথায়! ভাই হইবে সে তো ভাল কথা! কিন্তু বাড়ার সকলে মিলিয়া কেন তাহাকে জননীর অধিকার হইতে তফাতে রাখিতে চায়! আর এই ষড়যন্ত্রে মায়েরও গোপন সম্মতি আছে টের পাইয়া শিশু কেমন যেন হইয়া যায়। তাহার মাতৃস্তন্যের একচেটে অধিকারে কিসের জন্য

এই সতর্ক হস্তক্ষেপ! শিশুচিত্তে কেমন এক অনন্যমেয় সংশয়ের ছায়া ঘনায়।

বাসু তাই জবাব দেয় না। ঠাকুরমা আদর করিয়া কোলে টানিয়া বলেন, "বল দাদু, কাল তোমায় সন্দেশ দেব। বল ত একবার, তোমার ভাই হবে, না বোন হবে?"

বাসু খানিক ইতস্তত করিয়া জবাব দেয়, "বোন হবে।"

"তা হ'লে সন্দেশ পাবে না।" ঠাকুরমা হাসিয়া কোল হইতে তাহাকে একটু দূরে সরাইতে চান।

মধ্যবিত্ত বাঙালী-ঘরে ভাই না হইয়া বোন হওয়াটা যে কতখানি অপরাধের সে-কথা বুঝিবার বয়স না হইলেও বোন হইবে বলিলে যে সন্দেশ মিলিবে না এ-কথাটুকু ধরিতে বাসুর বিলম্ব হয় না। সে মৃদু হাসিয়া বলে, "ঠাকুমা, ভাই হবে আমার।"

"মুখে ফুলচন্দন পড়ুক," বলিতে বলিতে ঠাকুরমা সোহাগ করিয়া নাতিকে আবার কোলে টানিয়া নেন। ভাই-ই হোক, আর বোন ই হোক, শিশু-মনের শঙ্কা ঘুচে না।

অভিমানে চুপ করিয়া থাকে। মুখুজ্জে-গিন্নী আদর করিয়া বলেন, "নাতির আমার বুদ্ধি হয়েছে।"

যথাসময়ে মুখুজ্জে-পরিবারে আর একটি শিশুর আবির্ভাব হইল। সকাল হইতে ঠাকুরমার ব্যস্তসমস্ত ভাব, ধাত্রীর আগমন, তারপর থাকিয়া-থাকিয়া ওঘর হইতে জননীর চাপা আর্তনাদ, অবশেষে পিতার ঘন ঘন ঘড়ি দেখা, হঠাৎ এক সময় পাড়ার জন কয়েক মেয়ের সমস্বরে সাত ঝাঁক

হুলুধ্বনি,—এ-সব দেখিয়া শুনিয়া বিস্মিত বাসু চুপ করিয়া বসিয়া আছে মেঝের উপর।

ভাই হইবে কি-না সে কথা জানিবার আগ্রহ তাহার আর নাই। মা যে কি এক বিপদের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে সে-খবর কেহ বলিয়া না দিলেও সে অনুমানে বেশ বুঝিয়া লইয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া এক কোণে বসিয়া আছে। চার বছরের শিশুর মনে কেমন এক দুঃসহ শঙ্কা। ভগবান কি, সেই সত্য বা মিথ্যা বুঝিবার বয়স তাহার নহে, নতুবা সে বুঝি আজ দুই হাত জোড় করিয়া আকুল প্রার্থনা জানাইত, তাহার মায়ের যেন বিপদ পার হইয়া যায়, তাহার যেন কোন অকল্যাণ না ঘটে। সে এখন কাঁদিতে পারিলে যেন বাঁচে, কিন্তু কাঁদিবারও সে কোন একটা কারণ খুঁজিয়া পায় না। কথা বলিতে চায়, ভাষায় কুলায় না।

মুখুজ্জে গিন্নী ঘরে ঢুকিয়া পুত্রকে প্রশ্ন করিলেন, "ঘড়ি দেখেছিস্ বিনু?"

"দেখেছি মা, দশটা পনের মিনিট তেইশ সেকেণ্ড।" পুত্র বিনয়-ভূষণ পঞ্জিকার পাতায় সময়টা লিখিয়া রাখিল।

"আমার দাদুমণি কোথায় রে?" বলিয়া মুখুজ্জে-গিন্নী চারি দিক চাহিয়া বাসুর দিকে দৃষ্টি পড়িতেই হাত বাড়াইয়া আগাইয়া গেলেন, "এস মাণিক, তোমার কথাই সত্য হ'ল। ভাই হয়েছে তোমার। দেখ্‌বে চল।"

বাসু তেমনই চুপ করিয়া আছে। বাবা ও ঠাকুরমার হর্ষ প্রকাশের সঙ্গে খানিকক্ষণ আগে মার অস্ফুট ক্রন্দনের কোন সঙ্গতিই সে খুঁজিয়া

পাইল না। মাতৃস্তন্যে বঞ্চনা সত্ত্বেও ভাই হওয়ার সম্ভাবনায় সে যে উল্লাস প্রকাশ করিতে শিখিয়াছিল এখন তাহার লেশমাত্রও আর অবশিষ্ট নাই।

"এস দাদু. চল ভাই দেখবে চল।" ঠাকুরমা নাতিকে কোলে তুলিয়া লইয়া ঘরের বাহির হইয়া গেলেন।

সদ্যোজাত শিশু-ভাইকে দেখিয়া সে-ই যে বাসু ঠাকুরমার কোলে মুখ লুকাইল, আর মুখুজ্জে-গিন্নীর শত অনুনয়ে, পাড়ার বর্ষীয়সীদের বিস্তর সহাস্য সাধাসাধিতে একটি বারের জন্যও সে আর মুখ তুলিল না।

বাসু আঁতুড়ঘরের কাছ দিয়াও ঘেঁষে না। আজকাল সে ঠাকুরমার বড় বেশী ভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। বাবার সঙ্গে স্নান করে, ঠাকুরমার কোলে বসিয়া খায়, কাঠের ঘোড়াটা লইয়া রাতদিন খেলা করে। মা'র কথা যেন সে ভুলিতেই চায়।

সেদিন মলিনা অনেক চেষ্টায় ঝিকে দিয়া বাসুকে কাছে ডাকাইয়া আনিয়াছে। বাসু কিন্তু আঁতুড়ঘরের বাহিরেই দাঁড়াইয়া রহিল। মা ডাকে, "খোকন, বাপধন, ভেতরে এস না।"

বাসু কথার জবাব দেয় না। চৌকাঠের বাহিরেই চুপ করিয়া আছে।

বিস্তর সাধ্যসাধনার পর বাসু আঁতুড়ে ঢুকিয়া এক কোণে দাঁড়াইয়া

অন্য দিকে চাহিয়া রহিল। মলিনা মৃদু হাসিয়া ডাকিল, "কাছে এসে ব'স না লক্ষ্মী আমার—ও কি! ছি!"

অগত্যা বাসু মায়ের দিকে মুখ করিয়া একটুখানি আগাইয়া বসিল। ঘরের এক পাশে একখানি বড় কাষ্ঠখণ্ড ধিকিধিকি জ্বলিতেছে। অদূরে বসিয়া আছে মা। রুক্ষ এলো চুল, বিশুষ্ক অধর, মুখে চোখে কঠোর তপশ্চরণের করুণ সুন্দর রিক্ততা। জননীর এই তাপসী প্রসূতি-মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া চাহিয়া বাসুর প্রাণ দুঃখ ও সমবেদনায় ভরিয়া উঠিল। পার্শ্বস্থ সজীব মাংসপিণ্ডটাকেই মা'র এই কষ্টের কারণ মনে করিয়া পলকের জন্য শিশুর প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই অমনি বাসু চোখ ফিরাইয়া নেয়।

অল্প সময়ের মধ্যেই মাতা-পুত্রে আলাপ জমিয়া গেল। মা কহিল, "তোমার খাওয়া হয়েছে?"

"হুঁ"

"কি-কি দিয়ে খেলে আজ?"

"মাছ, ডাল, ভাজা—"

"কার সঙ্গে ব'সে খেয়েছ?"

"বাবার সঙ্গে।—আজ আমি নিজের হাতে খেয়েছি মা।"

"তাই নাকি! এই ত খোকন আমার বড় হয়েছে।"

বাসু মায়ের দিকে চাহিয়া গর্ব্বের হাসি হাসে। কথায় কথায় মলিনা হঠাৎ নবজাত শিশুকে কোলের কাছে সন্তর্পণে তুলিয়া বাসুর কাছে ধরিল, "ছাখ খোকন, কি সুন্দর ভাই তোমার—ওকি! উঠো না।"

বাসু উঠিয়া দাঁড়াইয়া মুখ ফিরাইল। মা ডাকিল, "খোকন, একবার এদিকে তাকাও। ছি! অমন করতে নেই। তোমার ভাই হয় যে!"

বাসু এক-পা দু-পা করিয়া দুয়ারের দিকে আগাইয়া গেল। মলিনাও পিছু ডাকিল, "কথা শোন, লক্ষ্মী মাণিক আমার!—অমন ক'রে যেতে নেই।"

লক্ষ্মী মাণিক ততক্ষণে ওঘরে গিয়া ঠাকুরমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িল।

মুখুজ্জে-গিন্নী তাহাকে বুকে আঁকড়াইয়া কহিলেন, "কি হয়েছে দাদু? বাবা বকেছে?—আঃ বল না, কি হ'ল।"

বাসুর মুখে কথা নাই। ঠাকুরমার কোলে শুধু ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

প্রসূতি এখন আঁতুড় ছাড়িয়া ঘরে আসিয়াছে। মা'র সঙ্গে বাসুর ভাব আবার একটু একটু করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। কিন্তু ছোট ভাই কাছে থাকিলে বাসু মার সংশ্রব এড়াইয়া চলে।

মাকে একলা পাইলেই খোকন তাহার কোল জুড়িয়া বসে। কখনও জননীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া বলে, "আজ তোমার কাছে শোব মা।"

"কেন, ঠাকুরমা কি তোকে ঘুমের মধ্যে চিম্‌টি কাটে?"

"নাক ডাকে।"

"বলে দেব।—মা!—"

"না-না, আর বলব না," হাসিতে হাসিতে বাসু মা'র মুখ চাপা দেয় কচি কচি হাত দুটি দিয়া।

মলিনা যদি কখনও মাতৃস্তন্যের লোভ দেখায় অমনি বাসু সপ্রতিভ হইয়া বলিয়া ওঠে, "আমার বুঝি খেতে আছে। আর! ও যে ভাই খাবে।"

জননী হাসিয়া ওঠে, "এই যে খোকন আমার বড় হয়ে উঠেছে গো।—আর আমার চিন্তা কি! এবার চাকরি করতে বেরবে,—কি বল?"

খোকন ঘাড় নাড়িয়া সায় দেয়। মলিনা সুধায়, "বাসু, তুমি রোজগার ক'রে আমায় খাওয়াবে ত?"

"হুঁ।

"আর কা'কে কা'কে খাওয়াবে?"

"বাবাকে।"

"ঠাকুরমাকে?"

"ঠাকুমাকেও।"

"ভাইটীকে?"

"ঈঃ!" বলিয়া বাসু ঘোর অসম্মতি জানায়। মা হাসিয়া বলে, "ওরে পাজি! এই তোর বুদ্ধি হয়েছে, এ্যাঁ! পেটে তোর এত হিংসে।"

বাসু লজ্জায় মায়ের কোলটিতে মুখ গোঁজে, আর মাথা তুলিতে চায় না। মলিনা হাসিয়া বলে, "যা,—আমার কাছ থেকে যা। হিংসুটে কোথাকার!"

শুধু কি এই! বাসু তার দুধের বাটি ও ঝিনুক লুকাইয়া রাখিয়াছে। দু-দিন বাদে ছোট খোকা আর একটু বড় হইয়া উঠিলেই, বড় খোকার ঝিনুক-বাটিতেই কাজ চলিবে, বাসু স্বকর্ণে ঠাকুরমাকে সেদিন এ-কথা

বলিতে শুনিয়াছে। চৌকির তলায় কাঠের সিন্ধুকটার পিছনে বাসু পরিত্যক্ত ছেঁড়া পা-পোষটা দিয়া ঢাকিয়া তাহার বাটি ও ঝিনুক লুকাইয়া রাখিয়াছে। মাঝে মাঝে গুপ্তধন বাহির করিয়া তাহার সেলুলয়েডের খোকা-পুতুলকে দুধ-খাওয়াইয়া আবার তাহা যথাস্থানে রাখিয়া দেয়। তবু ছোট ভাইকে তাহার সম্পত্তিতে ভাগ দিবে না সে।

মা সেদিন তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য প্রশ্ন করিল, "তোমার ছোট পুতুলটা ভাইকে একবার দেবে?"

বাসু নিরুত্তর। মা তাহাকে ঠেলিয়া দিল, "আমার কাছে তোকে আসতে দেব না।—যা। বেহায়ার বেহদ্দ!"

জননীর সঙ্গে বার-কয়েক হাতাহাতি করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া বাসু ঠাকুরমার এজলাসে গিয়া কাঁদিয়া পড়িল। সেখানে একতরফা ডিক্রি সে সব সময়ই পাইয়া থাকে।

মুখুজ্জে গিন্নী ডাকিয়া কহিলেন, "বৌমা, ওকে শুধু শুধু কাঁদাচ্ছ কেন?"

"একটিবার ভাইকে ছোট পুতুলটা দিতে বলেছি, তা কাণ্ড দেখ না! ভাইয়ের কি তোর সত্যি সত্যি পুতুল খেলার বয়েস হয়েছে নাকি রে।—হিংসুটের হদ্দ!"

"তাই তো দাদু, ভাইকে পুতুল দাও নি কেন?" ঠাকুরমা প্রশ্ন করিলেন।

"আমার পুতুল আমি কেন দেব?"

"তাহ'লে কাল যে গোকুল-পিঠে করব, তা তোমায় খেতে দেব না।"

"দেবেই ত।"

"ইস্—কুটুম্ আমার! খেতে দেবার আর লোক নেই কি

ঠাকুরমার রসিকতায় খোকনও জবাব দিল, "আমি লুকিয়ে খাব।"

"আমি আলমারীতে তালা বন্ধ করে রাখব।"

"আমি আমার বাবার সঙ্গে ব'সে খাব।"

মুখুজ্জে-গিন্নী হাসিয়া উঠিলেন, "তোর বাবা, আর আমার বুঝি কেউ নয়? আমার ছেলেকে আমি লুকিয়ে খাওয়াব। তুই কে রে মিন্‌সে?"

এবার নাতি ঠাকুরমার পিঠের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার আধ-পাকা চুলের গোছা টানিতে টানিতে কহিল, "আমায় না দিলে আমি তোমার চুল ছিঁড়ে দেব।"

নিরুপায় ঠাকুরমা তাহাকে কোলে টানিয়া কহিল, "আগে তবে বল, ভাইকে হিংসে করবে না।—তাকে পুতুল দেবে।"

"দেব।"

"যাও, নিয়ে এস।"

"আজ নয় ঠাকুমা কাল দেব।"

"ঠিক ত?"

"হ্যাঁ"।

ছোট খোকার বয়স এখন কয়েক মাস। আজকাল সে উপুড় হইতে শিখিয়াছে। হাত-পা ছুঁড়িয়া তাহার ছোট্ট ছোট পাশ-বালিশের বেড়া সরাইয়া দিতে পারে। সময় সময় অয়েল-ক্লথের বিছানা ছাড়িয়া বড় বিছানায়ও আসিয়া পড়িতে জানে।

বাস্থ ভাইকে আজকাল বাটি আর ঝিনুকে অধিকার দিয়াছে। তাহার খেলনাগুলি ভাইয়ের পাশে রাখিলে তেমন আপত্তি জানায় না আর। কিন্তু ভাইকে রোজগারের ভাঁগ দিবে কিনা সে-কথা জিজ্ঞাসা করিলে পূর্ব্বের মতই ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি জানায়,—তবে একটু মৃদুভাবে, মুচকি হাসির সঙ্গে।

ভাই কাছে থাকিলেও বাস্থ এখন মা'র কাছে যায়, মা'র কোলে শোয়। এক পাশে ভাই, আর এক দিকে বাস্থ। কখনও বা মাথা উঁচু করিয়া ওপাশে ছোট ভাইয়ের অশ্রান্ত হাত্‌-পা নাড়া দেখে, হাসে, মা'র চোখে চোখ পড়িতেই আবার মাথাটি এলাইয়া দেয় মায়ের কোলে। মলিনার মন খুশীতে ভরিয়া ওঠে।

স্থদিন আসিয়াছে মনে করিয়া মলিনা হয়ত কোন দিন বলে, "খোকন, পদ্মাসন করে ব'স না—হ্যাঁ, এই ঠিক্ হয়েছে।"

বাস্থ পদ্মাসন করিয়া জননীর দিকে চাহিয়া হাসে।

মলিনা ধীরে ধীরে শিশুকে তুলিয়া বাস্থর কোলে দিতে যায়। বাস্থ অমনি তড়াক্ করিয়া আসন ভাঙিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়।

মলিনা কত সাধে। বাস্থর স্থমতির লক্ষণ দেখা যায় না।

মুখুজ্জে-গিন্নী দেখিয়া বলেন, "পীড়াপীড়ি ক'রো না বৌমা। ওতে উল্টো ফল হয়। দু-দিন বাদে আপনি ওর হিংসে মরে যাবে। বাছাকে আমার যে এঁড়েয় পায় নি তাই যথেষ্ট।"

কিন্তু মায়ের প্রাণ তাহা বোঝে না। ভাইয়ে-ভাইয়ে মিলন না দেখিলে তাহার মন যে প্রবোধ মানিতে চায় না।

ঘরে লোকজন থাকিলে বাসু কখনো ছোট ভাইয়ের কাছে যায় না। দূর দূর দিয়া চলে। কিন্তু ঘরে যখন কেহ নাই, বাসু এদিক-ওদিক চাহিয়া চৌকির নিকট আগাইয়া যায়। শিশু শুইয়া থাকিয়া অশ্রান্ত হাত-পা নাড়ে। তাহার পা-দুটি লইয়া বাসু দিব্য খেলা করে। কখনো শিশু ঘুমের মধ্যে হাসে, আবার পরক্ষণেই কাঁদে। খানিক বাদেই ঠোঁট-দুটিতে আবার হাসির রেখা ফোটে। মেঘ ও রৌদ্রের এই ঘন ঘন পালা বদল দেখিয়া বাসুও হাসিয়া কুটিকুটি। আবার জাগ্রত শিশু যখন অবোধ্য ভাষায় শব্দ রচনা করিতে থাকে, বাসু তাহার কথার অনুকরণে 'অ-অ-অ' বলিয়া অর্থহীন জবাব দেয়। কাহারো পায়ের শব্দ পাইলেই বাসু কিন্তু ভাইয়ের নিকট হইতে যথাসম্ভব দূরে সরিয়া পড়ে।

একদিন বাসুর ইচ্ছা হইল পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, ছোট ভাইটির ক্রীড়াচঞ্চল কচি কচি পা-দুটি জোর করিয়া খানিকক্ষণের জন্য আটকাইয়া রাখিলে সে কেমন করে। বাসু তাহার দুই হাতের মুঠিতে পা-দুটি বন্ধ করিতেই সে অমনি আপত্তিসূচক এক প্রকার ক্রন্দন তুলিল। বাসু ক্ষণেকের জন্য ছাড়িয়া দিয়া আবার সেই নৃত্যশীল কোমল পা-দুখানি চাপিয়া ধরিল। খেলাটা তো মন্দ নয়!

অবোলা ছোট ভাইটির অনুনাসিক অসম্মতি প্রকাশে বাসু মজা দেখিতেছে ঠিক এমনি সময়ে ঘরে ঢুকিল মলিনা। ক্রীড়ামত্ত বাসু তাহা টের পায় নাই।

মলিনার মুখে-চোখে আনন্দের চাপা হাসি। ডাকিল, "কি হচ্ছে রে চোর!"

বাসু মুখ তুলিয়া মাকে দেখিয়া ছুটিয়া আলমারীর আড়ালে গিয়া মুখ লুকায়।

"এ্যা, তুই এমনি রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে চোরের মত ভাইয়ের সঙ্গে খেলা করিস। দাঁড়া, সবাইকে ব'লে দিচ্ছি।" মলিনা হাসিতে হাসিতে আলমারীর কাছে অগ্রসর হইল। দণ্ডায়মান বাসু বসিয়া পড়িয়া মুখ গুজিল দুই হাঁটুর ফাঁকে। মা আদর করিয়া তাহার মাথাটি তুলিবার চেষ্টা করিতেই সে মেঝেতে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া হাতের কনুইয়ের ভাজে মুখ লুকাইল।

মলিনা গলা ছাড়িয়া ডাকিল, "মা, একবার এ ঘরে এস, তোমার নাতির কীর্ত্তি দেখে যাও।"

বাসু সহসা উঠিয়া শক্ত করিয়া দুই হাতে জননীর হাঁটু জড়াইয়া তাহার শাড়ীর ভাজে সলজ্জ মুখখানিকে গোপন করিতে চাহিল। মা তাহার জানে জানুক, আর কেহ যেন এই অপযশের কথা শুনিতে না পায়। "লুকিয়ে লুকিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে ভাব! মাগো, কি ঘেন্নার কথা!" মলিনা তাহাকে কোলে তুলিয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল।

তবু বাসু সম্পূর্ণ ধরা দেয় না।

সমস্ত খেলনা সে ভাইকে দিয়াছে। রাত্রে আজকাল ভাইটির পাশেই মা'র বিছানায় শোয়।

ভাইয়ের জন্য যে একেবারেই দরদ নাই এমনও নয়। খোকাকে একলা ঘরে ফেলিয়া দৌড়িয়া রান্নাঘরে গিয়া জননীকে খবর পৌছায়, "শিগ্‌গির এস মা, খোকন যে কাঁদছে।" তথাপি উপার্জ্জনের অংশ ভাইকে দিতে এখনো রাজী নয়।

সবার সাথে

গ্রামে খুব বানরের উপদ্রব। এই জীবগুলিকে বাসুর সবচেয়ে বেশী ভয়। ঘুমের চোখে যখন সে কিছুতেই খাইতে চায় না, 'ঐ এল রে' বলিলেই তার তন্দ্রা ভাঙে, সকল আপত্তি টুটিয়া যায়।

মলিনা ভয় দেখায়, "এবার, সেই যে বড় লালমুখো বাঁদরটা—মনে আছে ত?—সেটা আবার যখন আসবে, ভাইকে তোর দিয়ে দেব। নিয়ে যে চলে যাবে, আর ফিরিয়ে দেবে না। তুই রাতদিন কেবল হিংসে করিস্।"

বাসু হাসে। মা যথাসাধ্য গম্ভীর হইয়া বলে, "হাসছিস্ কি, সত্যি সত্যি দেব।"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মলিনা জিজ্ঞাসা করে, "বাঁদরটাকে দিয়ে দেব—কি বলিস্?"

বাসু সম্মতি জানায়।

আর একদিন ডাইনীর মত কদাকার কালো বুড়ি পাগলীটা ভিক্ষা করিতে আসিলে ঠাকুর মা ছোট খোকাকে তাহার কাছে লইয়া গিয়া বাসুকে দেখাইয়া কহিলেন, "ওকে দিয়ে দিই? ওই ঝুলির মধ্যে করে নিয়ে যাবে।—কি গো, আমাদের রাঙা টুকটুকে ছেলেটি নেবে তুমি?"

বুড়ী রহস্য বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া কহিল, "নেব—দাও এই ঝুলির মধ্যে।"

বাসু কিন্তু পিছন হইতে ঠাকুরমার আঁচল টানিয়া তাহাকে ঘরের মধ্যে আনিতে চায়, অথচ মুখ ফুটিয়াও বলিবে না,—ভাইকে দিও না।

ওঘর হইতে মলিনা হাসিয়া কহিল, "দাও মা, দিয়ে দাও, ওর আপদ-বালাই দূর হয়ে যাক্।"

ঠাকুরমা নাতির দিকে মুখ ফিরান। নাতি অমনি লজ্জায় চৌকাঠের আড়ালে অদৃশ্য হয়।

সেদিন রবিবার। স্কুল নাই। বিনয়ভূষণ চৌকির উপর বসিয়া ত্রৈমাসিক পরীক্ষার খাতা দেখিতেছে। মুখুজ্জেগিন্নী তরকারী কুটিতে বসিয়াছেন। মলিনা রান্না ঘরে।

বাসু আজ সারা সকাল পুকুর-পাড়ে ও-বাড়ীর টুনি আর টেঁপীর সঙ্গে জলকাদা লইয়া 'ঘর-বাড়ী' খেলিয়া এইমাত্র ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে।

হঠাৎ তাহার ভাইয়ের কথা মনে পড়ে। কিন্তু খোকা তাহার বিছানায় নাই। ও-ঘরে গেল, সেখানেও নাই। রান্নাঘর, ঢেঁকিঘর, গোয়াল, বাহিরের ঘর, সর্ব্বত্র সে পাঁতিপাতি খুঁজিল, কোথাও বাসু ছোট ভ্রাতার দর্শন পাইল না।...ভাইটি গেল কোথায়! অথচ মা নিশ্চিন্তে রাঁধাবাড়ায় ব্যস্ত, বাবা একমনে কাগজ দেখিতেছেন, ঠাকুরমা রোজকার মত তেমনি আনাজ কুটিতেছেন। সবদিকে সবই ঠিক, অথচ ভাই গেল কোথায়?...

বাসু আবার বড় ঘরে ফিরিয়া আসে। আর একবার চৌকির তলাটা ভাল করিয়া দেখিয়া পিতার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কি ভাবিয়া সকল লজ্জা ত্যাগ করিয়া অবশেষে পিতাকে প্রশ্ন করিল, "ভাই কোথায় বাবা?"

বিনয়ভূষণ খাতা হইতে মুখ তুলিয়া একবার মনে মনে হাসিল। চাপা গলায় কহিল, "চুপ! তোর মা যেন এখন শোনে না। শুনলে এক্ষুনি কান্নাকাটি সুরু ক'রে দেবে। আমার স্কুলে যাওয়া আর হবে না। খাওয়ার আগে কাউকে বলিস্ নি যেন।" তারপর চোখে মুখে একটু কাঁদ-কাঁদ ভাব টানিয়া আনিয়া পুত্রকে জানাইল, "খোকাকে সেই বড় বাঁদরটায় নিয়ে গেছে।"

বিনয় গম্ভীরভাবেই আবার নিজ কার্য্যে মনোনিবেশ করিল। বাসু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল স্তব্ধের মত। তারপর সটান রান্নাঘরে গিয়া মা'র কোলে কাঁদিয়া ফাটিয়া পড়িল।

"তোর আবার আজ হ'ল কি?" মলিনা পুত্রকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

বাসু কিছুই বলিতে পারিল না। মলিনা ছেলেকে কোলে টানিয়া নেয়, "বল লক্ষ্মীটি, তোমায় কে কি বলেছে?—আঃ বল্ না।"

বাসু ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার কান্নার কাটা-কাটা ভাষা হইতে মলিনা অবশেষে এইটুকু ধরিয়া লইল যে ভাইকে বড় বানরটা আসিয়া লইয়া গিয়াছে।

মলিনা বুঝিল, এ কাণ্ড কাহার। পুত্রকে কোলে লইয়া গেল বড় ঘরে। গিয়া স্বামীকে হাসিতে হাসিতে কপট রোষ প্রকাশ করিয়া কহিল, "তোমার খেয়ে-দেয়ে আর কাজ নেই। কি ফ্যাসাদ বাধিয়েছ বল দিকিনি? কাজের সময় এ-সব ঝঞ্ঝাট ভাল লাগে! যাও, এখন খোকনকে নিয়ে এস গে।—আর পদি-পিসিমাই বা কেমনধারা লোক! সেই কোন্ সকালে নিয়ে গেছে, ওর দুধ খাওয়াবার সময়ও ত হয়েছে অনেকক্ষণ।

বিনয়ভূষণ ও-বাড়ী হইতে ছোট খোকাকে আনিতে গেল।

মলিনা বাসুকে প্রবোধ দেয়, "কাঁদিস্ নে। বাবা তোকে ফাঁকি দিয়েছে। এক্ষুনি আসবে তোর ভাইটি।"

খোকার পৌঁছিবার আগেই বাসুর ক্রন্দনের বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে।

"বোকা কোথাকার! ঠাট্টাও বোঝে না! ঐ ভ্যাখ্, তোর ভাই—মাথা তোল্।"—মলিনা কাঁধ হইতে বাসুর মাথাটি তুলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বাসু শক্ত করিয়া লাগিয়া আছে।

"মাথা তোল্ না, বোকারাম! ঐ যে তোর ভাই, ভ্যাখ্ না চেয়ে।"

বাসু এখন সবই বুঝিয়া লইয়াছে; মাথা তুলিতে চায় না শুধু মানের দায়ে। দুটি হাতে মা'র গলা জড়াইয়া সলজ্জ মুখখানি ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

মলিনা তাহার ঘাড়ে সুড়সুড়ি দিয়া মাথা জাগাইবার চেষ্টা করিল। তারপর বাসু মুখ তুলিয়াছে।

পিতার কোলে চঞ্চল ছোট ভাইয়ের ঢল-ঢল মুখখানি দেখিয়া মায়ের কোলে বাসুর অশ্রুসজল মেঘল মুখে হি-হি হাসির এক ঝলক রৌদ্র ফুটিল যেন।

মলিনা সহাস্যে স্বামীকে শোনাইয়া কহিল, "বাসু ত তার ভাইকে রোজগারের ভাগ দেবে না গো।"

"সত্যি না কি রে?"

"না বাবা।"

"মিথ্যাবাদী! বলিস্ নি?"

মলিনার প্রতিবাদে বারান্দা হইতে বিমুগ্ধা ঠাকুরমাও সায় দিয়া কহিলেন, "আমিও ত শুনেছি। মিথ্যে ব'লো না দাদু! তাহ'লে কিন্তু তোমার শাশুড়ীর নাকে গোদ হবে।"

বাসু লজ্জা পাইয়া আবার মাথাটি এলাইয়া দেয় মায়ের কাঁধে ছোট ভাইয়ের দিকে চাহিয়া মিটিমিটি হাসিতে থাকে তাহার দুষ্ট, দুটি মিষ্টি চোখ।

সমান্তরাল

পিঠাপিঠি দুই ভাই—আনু আর নানু

আনুর আদর্শ তার বাবা, নানু ভক্ত কাকাবাবুর। অর্থাৎ—

বাড়ীতে ঘোরতর রাজনীতি চর্চ্চা।

জয়ন্তবাবু গোঁড়া স্বদেশী। অবশ্য চরকায় তিনি সূতা কাটেন না, খদ্দরও পরেন না, খাঁটি গান্ধী-নীতিও মনে-মনে মানেন না; তবু অমনি এক সহজ পন্থায় ধনতান্ত্রিক দৃঢ়ভিত্তির উপর রাতারাতি গণতান্ত্রিক ইমার[illegible]র স্বপ্ন দেখেন তিনি।

ছোট ভাই সুবিমল—ইতিহাসের অধ্যাপক সুবিমল সেনগুপ্ত—আরাম-কেদারায় বই হাতে শুইয়া বসিয়া শ্রেণীহীন সমাজের এক প্রচণ্ড সমর্থক। সুতরাং দুটি ভাইয়ে মাঝে মাঝে লাগিয়া যায় মন্দ নয়।

ভরসার কথা মতান্তর মনান্তরে দাঁড়ায় না। অতএব, আপাততঃ, এই একান্নবর্ত্তী ছোট সংসারটির পাকা গাঁথুনীতে এতটুকু চিড় ধরিবার সম্ভাবনা নাই। তথাপি গৃহিণী সুলেখা মাঝে মাঝে শঙ্কিত হইয়া বৈঠকখানার দুয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়ান—স্বামী ও দেবরের পাড়া-মাতানো কাণ্ড দেখিয়া পরক্ষণেই হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া যান আর যাইতে যাইতে ভাবিতে থাকেন—পাগল আর বলে কাকে!

রবিবার সকালে—আজ ছুটির দিনে—বিতর্কের তুফান চলিয়াছে বৈঠকখানায়। গুটিকয়েক তার্কিক বন্ধুও আসিয়া জুটিয়াছেন। সমাজতান্ত্রিক সুবিমলের পক্ষ অবশ্য সংখ্যালঘিষ্ঠ। তবু এঁদের মুখের দাপটে অপর পক্ষ তটস্থ।

বার-তের বছরের বিচক্ষণ অ্যাডি্ভোকেট জয়ন্তবাবু আজ বাগযুদ্ধে ছোট-ভাই-এর কাছে কোণঠাসা হইয়া ভিতরে ভিতরে রীতিমত আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন—দেশের সামনে সত্যই তবে অনর্থের কালো মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে!

ওদিকে যে কালো মেঘের ছায়া পড়িতেছে নিজেরই ঘরে। সবার অলক্ষ্যে পড়ার ঘরে দুটি পিঠাপিঠি ভাইও তুমুল তর্ক জুড়িয়া দিয়াছে।

বড় ভাই আনু বলে, "তুই যেন বাবার চেয়ে বেশি বুঝিস্! হিটলারই বড়—ষ্ট্যালিন তো তার কাছে এই—এই এতটুকু।"

"ঈস্," পাল্টা জবাব দেয় নানু, "তুমি ভা—রি বিদ্যে ফলাতে এসেছ গির। আমি বুঝি আর কাকাবাবুর কাছে সব কথা শুনিনি?"

"হুঁ কাকা বললেই হ'ল! বাবা বলেছেন, হিটলারের কত শক্তি, কত সৈন্য তার। ষ্ট্যালিনের দল বুঝি তার সঙ্গে পারবে!—কথ্খনো না।"

"নিশ্চয় পারবে। হিল্টার আবার—"

আনু হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে, "হিলটার নয়রে, হিট্লার। নামটাও ভালো করে জানিস্ না, আবার এসেছিস তর্ক করতে।"

নানুর লজ্জার চেয়ে দুঃখই হয় বেশী। এত করিয়াও ঐ সহজ শব্দটার ঠিক উচ্চারণ তার মনে থাকে না।

আন্নু সুবিধা পাইয়া খোঁচা দেয়, "যা যা! আগে নাম-ধাম সব মুখস্ত করে আয়।"

নান্নু রাগিয়া বাহিরে আসে—বোধ হয় নিজেরই উপর। ভারী তো একটা নাম!

ধীরে ধীরে বৈঠকখানায় ঢুকিল নান্নু। সেখানে তখন অনর্গল চলিয়াছে মতবাদের কাটাকাটি আর যুক্তিতর্কের লাঠালাঠি। যেন, রসা রোডের এই তেতলা বাড়ীটার দোতলার বৈঠকখানায় আজই ধনতন্ত্র বনাম সমাজতন্ত্রের শেষ বোঝাপড়া হইয়া যাইবে।

খানিকবাদে আন্নুও আসিয়া হাজির। দুটি ভাই এক কোণে চুপ-চাপ বসিয়া রহিল। বাবা আর কাকাদের গলাবাজি শুনিবার ধৈর্য্য তাহাদের নাই। বসিয়া আছে একটা বিশেষ মতলবে।

এক সময় দুটি ভাই টেবিলের কাছ থেকে সে-দিনের দুখানি সংবাদ-পত্র লইয়া সরিয়া পড়িল।

পড়ার ঘরে আসিয়াই নান্নু "আনন্দ-রাজার" হইতে লা পসিওনারিয়ার ছবিটি কাঁচি দিয়া কাটিয়া লইতেছিল।

আন্নুও "অমৃতবাজারের" ডবল-কলম সংবাদের মধ্য হইতে ভ্রূকুটি-কুটিল মুসোলিনীর কাট্‌আউট্‌ ছবিখানি পিন্‌ দিয়া তুলিয়া লইল।

নান্নু এতক্ষণে একটা সুযোগ পাইয়াছে—তখনকার অপমানের জবাব-দিল, "ভারি তো ছিরি!—টেকো।"

"আর তোর ষ্টালিন সুন্দর, না? যে না রূপ—প্যাঁচার মত মুখ! গোঁফ তো নয় যেন বেড়ালের ল্যাজ।"

"তোমার হিলটারের চুলগুলো তো ঝাঁটার কাঠি।—গোঁয়ার-গোবিন্দের মত চেহারা।"

পাল্টা জবাবে হাত নাড়িয়া মুখভঙ্গি করিয়া আনু কহিল, "তাই না কি!—জানিস্, হিটলারই জিতে যাচ্ছে।"

নানু কথা কাটাকাটিতে আর তত সুবিধা করিতে না পারিয়া এবার 'অথরিটির' দোহাই পাড়ে, "ঘোড়ার ডিম! ষ্ট্যালিনের দলই জিতবে। কাকার কাছে জিগ্‌গেস্ করে দেখিস্।"

আনু বয়সে বড়, বুদ্ধিও কিছু বেশী। সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল, "বাবার চেয়ে কাকা বুঝি বেশি বোঝে?"

এবার আনুর মুখে কথা বন্ধ হয়। বার বছরের বালকের কাছে সত্যই এ এক দুরূহ প্রশ্ন! বাবাকে সে কিছুতেই ছোট করিতে পারে না, আবার কাকাকেও খাটো ভাবিতে মনে প্রাণে নারাজ। এই দুই বিরুদ্ধ ভাবের দোটানায় পড়িয়া এক বাঙ্গালী কিশোরের স্বল্প-পরিসর স্বচ্ছ মনখানি খানিকক্ষণের জন্য ঘোলাটে হইয়া ওঠে।.........

বৈঠকখানার তর্ক-যুদ্ধ আজ সকাল-সকাল থামিল। কি এক কাজে জয়ন্তবাবুকে বাহিরে যাইতে হইয়াছে।

সুবিমলেরও হাতে আজ অনেক কাজ। একটা বড় প্রবন্ধ লিখিতে হইবে। বিষয়টি দস্তুরমত শক্ত—গণ-সাহিত্য ও গণ-আন্দোলনের অন্তর্নিহিত যোগাযোগ। পরন্তু বিকালের মধ্যে শেষ করিয়া প্রেসে

দেওয়া চাই-ই—আগামী রবিবার নিখিল-বঙ্গ-অগ্রগামী-সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ লিখিবার ভার পড়িয়াছে সুবিমলের উপর।……

কি উৎপাত! কলম আর কাগজ লইয়া বসিতে না বসিতে পড়ার ঘরে সোরগোল সুরু হইয়াছে। বৌদির গলা চড়িল সপ্তমে। আনু আর নানু কি লইয়া যেন ঝগড়া বাধাইয়াছে। বাধাক্। সুবিমল এখন উঠিতে পারিবে না।

কিন্তু ওঘরে যে দুজনের পিঠেই সশব্দে বেশ কয়েক ঘা পড়িতেছে! অগত্যা সুবিমলকে উঠিতেই হয়।

বৌদিদির সঙ্গে দেবরের দেখা হইল পড়ার ঘরের বাহিরেই—বারান্দায়। সুলেখা উত্তমমধ্যমের সহজ ব্যবস্থাটা সারিয়া গজ্‌গজ্‌ করিতে করিতে ফিরিতেছে।

সুবিমল সকৌতুকে প্রশ্ন করিল, "সকাল বেলায় হঠাৎ এই 'রণং দেহি' মূর্ত্তি যে বৌদির! ব্যাপার কী?"

সুলেখা যেন তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল, "তোমাদের জ্বালায় এ সংসারে বাস করা দায় হয়ে উঠ্‌ল।"

"ব্যাপারখানা কী?" সুবিমল হাসিয়া উঠিল। ব্যাপার যে কি তাহা বোঝা গেল না। সুলেখা কেবল ঝাঁজিয়াই চলিয়াছে, "একদিকে তোমরা জ্বালাবে, আর একদিকে জ্বালাচ্ছে ঐ বালাই দু'টো। আমি তো আর মানুষ নই! সারাদিন খেটে খেটে মুখে রক্ত উঠে মরি, তারপর বাকি আবার এ-সব সয়!"

বাড়ীতে ঝি-চাকর থাকিতেও গৃহিণী যদি মুখে রক্ত উঠিয়া মরেন

তো মরুন, সে চিন্তায় ভাবিত হইবার কারণ নাই। সুবিমল শুধু জানিতে চায় ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাবা-কাকাও কি এক মহা অপরাধ না কি করিয়াছে সেকথাটাই।

তাই এবার যেন একটু বিরক্ত হইয়াই কহিল, "এ তো আচ্ছা বিপদ! কী হয়েছে খুলেই বলো না।"

"হবে আবার কী! তোমরা দু'ভাইয়ে নাই দিয়ে ওদের মাথায় তুলেছ, এখন সামলাতে হয় আমাকে!—ওদের আর কী দোষ? বাপ-খুড়োকে যেমন ছাখে তেমনি তো শিখবে!"

নান্নু ইতিমধ্যে বারান্দায় আসিয়াছে চোখ মুছিতে মুছিতে।

"কি রে নান্নু, তোরা কী সব আরম্ভ করেছিস বল্‌তো!"

কাকার কথায় অমনি নান্নু নাকী সুরে আরম্ভ করিয়া দিল "দাদা আগে আমার অ্যালবামের ছবি ছিঁড়লে কেন?"

বলিতে না বলিতে ঘরের মধ্য হইতে আন্নুও ফুঁসিয়া বাহির হইল,—"না কাকাবাবু, ও মিথ্যে করে বলছে। আগে আমি ওর ছবি ছিঁড়ি নি। ওই তো আগে আমার ছবিকে গালাগাল দিলে।"

সুবিমল তো অবাক: অ্যালবাম! ছবিকে গালাগাল! এসব বলে কি ওরা!

"কিসের অ্যালবাম?—কার ছবি?" কাকা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

আন্নু জবাব দিতে ইতস্ততঃ করিতেছে। রাজনীতির ধার ধারিবার বয়স অবশ্য হয় নাই, তবু আন্নু ইতিমধ্যেই জানে—কাকার কাছে তার সুবিচার পাইবার আশা নাই। কাকা যাদের পছন্দ করেন না,

তাদেরই বিভিন্ন সময়ের ও বিভিন্ন ধরণের ছবিগুলি লইয়াই তাহার অ্যালবামের সযত্ন সংগ্রহ।

সুবিমল কৌতুক অনুভব করিল। কে সে মহাপুরুষ শুক্‌নো কাগজের মধ্যেও যাঁহাকে কটূক্তি করিলে ভক্তের প্রাণে লাগে? হাসিয়া কহিল, "নানু কাকে গাল দিয়েছেরে? কে সে ভাগ্যবান?"

"হিটলার" গম্ভীর হইয়া জবাব দেয় আনু।

"বটে!" সুবিমল হাসিয়া উঠিল, "চল—তোদের ছবি দেখব।"

ঘরে ঢুকিয়া নানুই প্রথম তার অ্যালবাম লইয়া আসে—যেন কাকার কাছে তারই অধিকার সবার আগে।

সুবিমল হাসিতে হাসিতে নানুর ছবি-সংগ্রহ দেখিয়া চলিল: লেনিন, ষ্ট্যালিন, লিটভিনফ্, ভরশিলভ্, লা পাসিওনারিয়া, দিয়াজ নেগ্রিন, কার্ল মার্ক্স......মস্কোর রাজপথে বিরাট শোভাযাত্রা, সোভিয়েট ট্যাঙ্কবাহিনীর কুচকাওয়াজ, একদল নারী প্যারাসুট সৈন্যের মহড়া, মাদ্রিদের উপকণ্ঠে গণতান্ত্রিক স্পেনের গোলন্দাজ বাহিনী। ইত্যাকার ও ইত্যাদি।

"এবার তোর অ্যালবাম্ নিয়ে আয় দেখি।"

আনু গরজ দেখায় না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াই আছে।

"কৈ, নিয়ে আয় তোর অ্যালবাম—দেখি, কার ছবি ভালো, কে কত কালেকট্ করেছিস।"

এবার আনু আগাইয়া আসে—তার সংগ্রহ নানুর দ্বিগুণেরও বেশী।

সুবিমল সহাস্যে আনুর অ্যালবামের প্রথম পাতায় চোখ বুলায়। সুরু হইল: মুসোলিনী, হিটলার, গোয়েরিং, গোয়েব্‌লস্, জেনারেল ফ্রাঙ্কো, সুনার, ইয়াগে—অর্দ্ধেকের বেশী পৌঁছিয়া এতক্ষণে সুবিমলের

হুঁস হইল, আন্নুর অ্যালবাম যে দস্তুরমত অ্যান্টি-কমিণ্টার্ণ অ্যাক্সিস! আন্নুর মুখের দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিয়া, আবার ছবি দেখা সুরু করিল—কামানের উপর মুসোলিনী, মাইক্রোফোনের সম্মুখে হের হিটলার, গোয়েরিং এর প্রমোদ-ভবন, বার্লিনের রাজপথে ট্যাঙ্কবাহিনী, আবিসিনিয়ায় ইতালীর সেনা-নিবাস, স্পেনের উপকূলে বিদ্রোহীদের রণতরী, সংহাই-এর গগনস্পর্শী সৌধশিরে বৈশ্বানরের ধ্বংসলীলা...... এমনি পাতার পর পাতা, ছবির পর পর ছবি!

"বাঃ! চমৎকার কালেকশন্ তোর" সুবিমল হাসিয়া আন্নুর দিকে তাকায়, "তোর তো দেখ্ছি, গোটা দশেক হিটলার নান্নু গাল্ দিলে কাকে?"

আন্নু জবাব দেয় না।

"কি রে নান্নু, দাদা তোর ছবি ছিঁড়েছে বলে চেঁচাচ্ছিলি। কৈ, তোর অ্যালবামে তো কোন ছেঁড়া-ছবি পেলাম না।"

"ওতে নেই," বলিয়া নান্নু তার টেবিলের ড্রয়ার থেকে লা পাসিওনারিয়ার ছবিটি লইয়া আসিল—দিন কয়েক আগে স্পেনের এই মহীয়সী নারীর ডবলকলম আবক্ষ-ছবিখানি আনন্দবাজারে বাহির হইয়াছিল। সত্যই আন্নু এই বীরাঙ্গণাকে সাঙ্ঘাতিক জখম করিয়াছে।

সুবিমল হাসিয়া কহিল, "এই নিয়ে এত হাঙ্গামা? আমায় বললেই তো হ'ত। লা পাসিওনারিয়ার এর চেয়েও সুন্দর একখানা ছবি তোকে দিতাম—"স্ফিয়ারে' বেরিয়েছে।"

"কোথায় আছে কাকাবাবু?" নান্নু উল্লসিত হইয়া ওঠে।

"এখন আর পাবি নে।—ঝগড়া করলি কেন?"

নান্নু চুপ করিয়া থাকে।

"আন্নু, তোর কালেকশনই চমৎকার!—নান্নুটা কোন কাজের নয় —এখনো ওর অ্যালবামের আদ্ধেকও ভরে নি।"

নান্নু নীরব। আন্নু হয় খুসী। এবার সে একটু ভরসা পাইয়া নান্নুর মত কাকাবাবুর কাছ ঘেঁসিয়া বসে।

সুবিমলের দুদিকে দুই ভাই-পো তার। মুখে হাসিলেও মনে মনে তার কেমন যেন অস্বস্তি। আন্নু ও নান্নু এই বয়সেই রাজনীতির প্রথম পাঠ গ্রহণ করিতেছে নাকি ?

তাই না নান্নু পড়ার ঘর থেকে কাকার কাছে যাইয়া কতদিন প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়াছে, এই ছবিটি কার ?......এরা কোন পক্ষের সৈন্য ?... এই যুদ্ধ-জাহাজ কোন দলের ?—হিটলার না ষ্ট্যালিনের ? আন্নুও এ-জাতীয় প্রশ্ন করিত প্রায়ই। ইদানীং সে আর আসে না কেন ?

সরল বিশ্বাসে সুবিমল জিজ্ঞাসু ভাই-পোদের কৌতূহল তৃপ্ত করিয়াছে যখন তখন। এদিকে যে দুই ভাই দুটি সমান্তরাল ব্যবধান রচিয়া চলিয়াছে ধীরে ধীরে খেলার ছলে।

সুলেখা ঘরে ঢুকিল। কোলে খোকা—তার তিন নম্বর। রাগ পড়িয়াছে অনেকক্ষণ আগেই। হাসিয়া হাসিয়া কহিল, "ভাইপোদের যে বড় আদর দেখানো হচ্ছে!"

সুবিমল হাসিয়া দু-ভাইয়েরই মাথা বুকের কাছটায় টানিয়া নিল।

"ঠাকুর-পো, তোমাদের দেশোদ্ধারের কচমচি বাইরে থেকেই সেরে এসো।—তোমাদের দেখাদেখি ছেলে দু'টোরও যে শেষে মাথা খারাপ হতে চলল।"

"সে তো ভালোই বৌদি! এ বয়সেই কত কী শিখছে।"

"অ্যাঁ! এ-সব শিখে আমার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করবে।"

"হাসি নয়, বৌদি! ওরা বড় হ'লে, তুমি দেখে নিয়ো—আমাদের চেয়ে ঢের বেশি জানবে ওরা, কত কী শেখাবে।"

মায়ের মন খুশিতে ভরিয়া ওঠে নিঃসন্দেহে। তবু সকৌতুকে কহিল, "রক্ষে কর! এখনকার ঠেলা সামলানোই দায়। অত সুখে কাজ নাই আমার—হাসছ কি!—তোমরা তো বাইরেই বেশির ভাগ থাক, বিপদ যত আমার। সময় নেই অসময় নেই তোমার পণ্ডিত ভাই-পোরা এসে কেবলি বিরক্ত করে—বলো দিকিনি মা, বাসিল কোথায়? বল তো, পার্সিনার কোন দেশের মেয়ে?"

"পার্সিনার নয়, পাসিওনারিয়া," বলিয়া নান্নু অট্টহাস্যে জননীর ভুল সংশোধন করে।

সুলেখা কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করিয়া কহিল, "সত্যি বলছি ঠাকুর পো, এ অপমান আমার সহ্য হয় না। হয় আমায় লেখা-পড়া শেখাবার জন্যে একটা মাষ্টার রেখে দাও, নয় তো তোমাদের স্বদেশী টদেশী বাড়ীর বাইরে করো—আমি বাপু মুখ্‌খু-সুখ্‌খু মানুষ, তোমাদের অত কথার জবাব পাব কোথায়!"

"কেন? ঘরেই তো তোমার দু' দুটো মাষ্টার রয়েছে," সুবিমল হাসিয়া উঠিল, "আরো একজন মাষ্টার—ঐ তো তোমার কোলে হাস্‌ছে, বৌদি!"

সবার সাথে

বিকালে সুবিমল আবার লেখা লইয়া বসিয়াছে। কলমটা বড় অবাধ্য আজ—কিছুতেই দ্রুত চলিতে চায় না। এখনো কত কথা বাকী। স্পেনের গৃহ-যুদ্ধে ফ্রাঙ্কো-ব্রিটিশ নিরপেক্ষতা নীতির আসল কথাটা সুবিমল যখন খোলসা করিতে হাত দিয়াছে—

"কাকাবাবু!"

নান্টু খোকনকে লইয়া পায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আধ-শোওয়া কাকাবাবু বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করে, "কী খবর?"

"আজকের কাগজ পড়েছ তুমি?"

"হ্যাঁ"

"ফ্রাঙ্কো নাকি সব দখল করে নিচ্ছে—আর লেলিনের দল হেরে যাচ্ছে?"

"লেলিন নয় রে, লেনিন"—সুবিমল হাসিয়া ওঠে। লজ্জিত নান্টু মাথা নোয়াইয়া বলে, "বল না কাকাবাবু, স্পেনে এখন কারা জিতছে?"

"ফ্রাঙ্কো।"

"ধ্যাৎ!"—অবিশ্বাসে নান্টু কাকার দিকে তাকায়!

"সত্যি, ফ্রাঙ্কোই জিতে যাচ্ছে—তবে···"

সুবিমল একটু থামিল। নান্টু কিন্তু উন্মুখ হইয়া আছে।

"তবে কী কাকাবাবু?"

"তবে"-টা খুব আশাপ্রদ নয়। তবু বার বছরের কিশোর ভ্রাতুষ্পুত্রটীর অমন স্বচ্ছ সুন্দর অন্ধ অনুপ্রাণনায় আঘাত দিতে বড় লাগে। সত্য গোপন করিয়াই সুবিমল জানাইল, "শেষটায় ফ্রাঙ্কোই

হেরে যাবে—এখনো যুদ্ধের কতটুকু! বার্সিলোনা আছে, ম্যাড্রিডও আছে যে!”

নানুর মুখখানি খুশিতে ভরিয়া ওঠে। এবার সে আর একটা প্রশ্ন করে, “ফ্রাঙ্কোর দলে তো হিটলার আর মুসোলিনী রয়েছে, না?”

“হুঁ”

“অথচ দাদা বলে কী শুনবে?—ফ্রাঙ্কো একাই যুদ্ধ করছে। ফ্রাঙ্কো নাকি স্পেনের রাজা ছিল, লেনি—লেনিন এসে অন্যায় করে তাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তাই এ যুদ্ধ। সত্যি নাকি কাকাবাবু?

“লেনিন তো অনেক দিন মরে গেছে রে।”

“লেনিন বেঁচে নেই?”

“না।”

কথাটা যেন সুখের নয় এমনি ভাবেই নানু চুপ করিয়া গেল। সুবিমলের মনেও একটা ভাবনা দেখা দিয়াছে। আনু আর নানু যে অনেকখানি অগ্রসর! লক্ষণ তো ভাল নয়। ছবি সংগ্রহের সখ উপলক্ষ্য করিয়া দুটি তরুণ মনে বীর পূজার প্রতিযোগিতা সুরু হইয়াছে। আজ বাদে কাল না ওরা বড় হইয়া উঠিবে! যত ভাবনা তো সেইখানেই। তখন বিশ্বাসের ভিত্তির উপর যার যার মতবাদের ইমারত উঠিবে দেখিতে দেখিতে!

“কাকাবাবু!”

“বলো।”

“আমাদের দেশের কাগজগুলোতে হিটলার-মুসোলিনীদের ছবিই বেশি থাকে কেন?”

"কে বললে বেশি থাকে ?"

"আমি তবে পাই না কেন ?"

"তুই বোকা তাই।"

নান্নু খানিক নীরব থাকিয়া আবার বলে, "বিলিতী পত্রিকায় ওদের দলেরই বেশি ছবি।"

"ক্ষতি কী ?"—সুবিমল হাসিয়া উঠিল।

"বা রে ! আমার যে ছবি কম পড়ে যায় !—আর ওদিকে দাদার একটা অ্যালবাম ভরতি হয়ে গেছে কত আগে। আমার এখনো আদ্দেকই হ'ল না।"

সুবিমল নীরব। প্রতিযোগী এখানে দুইটি ভাই—তাহারই দুই ভ্রাতুষ্পুত্র। তার কাছে দুই ই সমান—অন্ততঃ সমান হওয়াই তো উচিত। নান্নু যদি তার অনুরক্ত, আন্নুও তো পর নয়।

কাকাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া নান্নু কহিল, "খোকন কি বলে শোন কাকাবাবু !"

"খোকন !"

"হ্যাঁ কাকাবাবু, খোকন বলেছে ফ্রাঙ্কো হেরে যাবে। সেদিন মাও বলছিল,ছোট্ট ছেলেপেলের জবাব নাকি ঠিক হয়। আজ তিন-তিনবার জিগগেস করেছি, খোকন পেত্যেক বারই বলেছে—ফ্রাঙ্কো হারবে।"

"যা দুষ্টু ! খোকন বুঝি অত কথা বলতে পারে !"

"বিশ্বাস হচ্ছে না ? আচ্ছা !" নান্নু হাসিতে হাসিতে উঠিয়া পড়িল। চঞ্চল শিশু কখন বিছানা হইতে নামিয়া বারান্দায় গিয়া বল লইয়া খেলা সুরু করিয়াছে আর আপন মনে বলিয়া চলিয়াছে কত কি কথা।

হাঁটিতে শিখিয়াছে এই তো সেদিন, কিন্তু মুখ ফুটিয়াছে তার অনেক আগে।

নান্নু খোকনকে লইয়া আসিয়া হাজির। খোকনের ইচ্ছা নাই, জোর করিয়াই দাদা তাকে কাকার কাছে আনিয়াছে।

"খোকন! বল তো একবার......"

মুখোমুখি দাঁড় করাইয়া দিতে না দিতে আবার খোকা ফিরিয়া দাঁড়ায়। মেজাজ ভাল নয়। নান্নুও নাছোড়বান্দা। আবার তাকে সাধ্য-সাধনা করিয়া কাকাবাবুর সামনাসামনি দাঁড় করাইয়া দিল।

"বল তো খোকন, লক্ষ্মী ভাইটি আমার—"

লক্ষ্মী ভাইটি উসখুস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। নান্নু তাকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিল।

"বল দিকি নি এবার, কে হারবে। ফ্রাঙ্কো?"

শিশু বিরক্ত হইয়া বলে—"না।"

"এই পাজি ছেলে! ঠিক করে বল্। নইলে চকোলেট দেব না কিন্তু—বল এবার ফ্রাঙ্কোই হারবে তো?"

"না"

নান্নু একেবারে নিরাশ হইল। আজ সারা সকাল এত করিয়া শেখানো-পড়ানো সবই মাঠে মারা গেল।

কাকাবাবুর কাছে তার অপরিসীম লজ্জা বাঁচাইয়া এমন সময় ঘরে ঢুকিল সুলেখা। খোকাও ছাড়া পাইয়া এক দৌড়ে মায়ের কোলে উঠিয়া রেহাই পায়।

নান্নু সরিয়া পড়িয়াছে। সুলেখা হাসিয়া কহিল, "ব্যাপার কী ঠাকুর-পো, ভাই-পো তোমার অমন চোরের মত সরে পড়ল যে?"

সুবিমল হাসিয়া কহিল, "দেখছ না বৌদি! ঢেউয়ের পর ঢেউ।"

"মানে?"

"মানে অতি পরিষ্কার।—আমি, তার পরেই নানু, তারপর একদিন—আজকের এই খোকনমণি!" বলিয়া সুবিমল হাসিয়া মায়ের কোলে দুই বছরের ভাইপোটির দিকে একবার চাহিল।

"আমি বাপু মুখ্যু মেয়েমানুষ—তোমাদের এ-সব ধোঁয়াটে কথার অর্থ বুঝি নে।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে সুলেখা ঘরের বাহির হইয়া গেল।

সুবিমল সোজা উঠিয়া দাঁড়ায়। লেখা আজ আর হইবে না।......চেম্বারলেনের এ কেমনধারা নিরপেক্ষতার নীতি—যার ফলে লাভবান হইতেছে শুধু এক পক্ষ!...নিরপেক্ষতা!......আনুর অ্যালবাম ভরিয়া গেল, আর নানু এখনো—

সুবিমল ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে থাকে ঘন ঘন।......সে যেন এ-যুগের—অন্ততঃ এই একটা দিনের—সক্রেটিস্, আর নানু তারই যোগ্য শিষ্য প্লেটো! এর মধ্যে নিরপেক্ষতার প্রশ্ন আসে কেন? তবে কি এতদিন মনেপ্রাণে যাহা সত্য বলিয়া মানিয়া আসিতেছে তার সেই বিশ্বাসের ভিত্তি বড় কাঁচা?.........

জামাটা গায় দিতে দিতে সুবিমল ডাকিল জোর গলায় "নানু!"

ও-ঘর হইতে জবাব আসে, "যাই কাকাবাবু!"

সুবিমল আয়নার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। নানুও আসিয়া হাজির।

"আমায় ডাকছ?"

"হুঁ" মাথায় চিরুণী বুলাইতে বুলাইতে সুবিমল কহিল, "আমি আজ একবার মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে যাব ফেরবার পথে।" খানিক থামিয়া

আবার বলিয়া চলিল, "আন্নুকে বলিস্ নি, তোকে আজ অনেক ছবি এনে দেব—ভালো ভালো ম্যাগাজিন থেকে। তোর অ্যালবাম আজই ভরত্তি হয়ে যাবে।"

এক নিমেষে নান্নুর মুখখানি খুশির হাসিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। সুবিমলও চাঙ্গা হইয়া ওঠে। নিরপেক্ষতার মুখোস খসিয়া পড়িয়াছে!

"কাউকে বলিস্ নি যেন। বাবা, মা, আন্নু কাউকে নয়।"

নান্নু ঘাড় নাড়িয়া সায় দেয়।

"এবার তবে যা! সন্ধ্যের পর আমি বাসায় ফিরব—তখন এ-ঘরে একবার আসিস্।"

নান্নু মহা আনন্দে ঘরের বাহির হইয়া গেল যেন এক লাফে।

সুবিমল ট্রামে উঠিয়া মনে মনে আর একবার আওড়াইল,

Cowardice! thy name is neutrality!

* * * *

মাস কয়েক বাদে।

আজ রবিবার। ছুটির দিন। দুপুর বেলা সুবিমল নিজের ঘরে বিছানায় শুইয়া বাহিরে চাহিয়া আছে। মন বুঝি আজ ভাল নাই। সকালের আনন্দবাজারে মোটা হরফের ডবল-কলম হেডিং বাহির হইয়াছে—মাদ্রিদের উপকণ্ঠে বিদ্রোহী বাহিনী! ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের বড় বড় অক্ষরও ঘোষণা করিতেছে—FALL OF MADRID IMMINENT.

এই কয়মাসে ইউরোপের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে ক্ষিপ্রগতিতে যে দৃশ্যের পর দৃশ্য চলিয়া গেল তাহা নাটক নয়, চলচ্চিত্র। সেই অলোড়নের

কম্পন যখন সারা দুনিয়ায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তখন রসা রোডের তেতলা বাড়ীটার দোতলার ফ্ল্যাটে অবস্থিত ছোট এক সংসারের উপরও যে একটু আধটু প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি!

বিচিত্র কিছুই নয়। তাই জয়ন্তবাবু ইউরোপীয় শক্তিবাদকে এক ভারতীয় আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার উপর দাঁড় করাইয়া এ-দেশের তথা সমগ্র বিশ্বের মুক্তি ও শান্তির নূতন মতবাদ প্রচারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। স্থানে স্থানে শাখা সমিতি স্থাপনের উদ্যোগ-আয়োজন যথোপযুক্ত অর্থের অভাবে কিছুটা দেরী হইতেছে এই যা।

তা ভাল কথা। কিন্তু এদিকে যে আনু ও নানুর প্রতিযোগিতা অ্যালবাম ছাড়িয়া কাগজে কলমে উঠিয়াছে। দুই ভাই-এ মিলিয়া ইতিমধ্যে নাকি ডজন খানিক কবিতা লিখিয়াছে।

শুধু কি এই!—আনু এবার সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিয়াছে। রচনার খাতায় শিবাজীর জীবন-চরিত লিখিতে গিয়া অকারণে মুসোলিনীর সঙ্গে তুলনা টানিয়া আনে। দেয়ালে-টাঙান ফ্রেমে আঁটা হিটলারকে মাঝে মাঝে ফুলের মালা পরাইয়া দেয়।

এদিকে নানুর দৃষ্টিও ঘরের গণ্ডি কাটিয়া বাহিরে আসিয়াছে—পাড়ার ছেলেরা মিলিয়া একটা কিশোর-সঙ্ঘ খুলিয়াছে, নানু নাকি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অন্যতম সভ্য এবং সঙ্ঘের মুখপত্র হাতে-লেখা ম্যাগাজিনের একজন নিয়মিত পাঠক।

ভারতের রাজনীতিক ক্ষেত্রেও ইতিমধ্যে বহু ছোট-বড় ঘটন ও অঘটন ঘটিয়াছে। মাদ্রাজে সংশোধিত ফৌজদারী আইনের অহিংস প্রয়োগ, বোম্বাইয়ের শ্রমিক ধর্ম্মঘটে পুলিশের মোলায়েম গুলি চালনা,

মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রিমণ্ডলের ঘরোয়া বিবাদ, ওয়ার্দ্ধার ধ্যানভঙ্গ, দেশীয় রাজ্যের গণআন্দোলন, রাজনৈতিক-বন্দী মুক্তির সমস্যা, নিখিল ভারত প্রগতি সাহিত্য সম্মেলন, আসামে কংগ্রেস কোয়ালিশন—বাদ-প্রতিবাদ, উত্তর-প্রত্যুত্তর, বক্তৃতা ও ইস্তাহারে সারা ভারত সরগরম।

বিছানার উপর আধ-শোওয়া সুবিমল আজ বিগত কয়েক মাসের এই সদ্য ইতিহাস মনে মনে বিচার করিয়া দেখিতেছিল।

বেলা তিনটা। ছুটির দিনে এ সময়টা নান্নু এ-ঘর ও-ঘর করে। আজ আর তার দেখা নাই। সকালে কাকার কাছে বড় নৈরাশ্যের সংবাদ শুনিয়া গিয়াছে।

টেবিলের উপর একখানি ইংরেজী-দৈনিকের ছবির পাতাটা পড়িয়াছিল—স্পেনের আকাশে এক ঝাঁক বোমারুবিমান; তারই পাশের ছবিতে : দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে বাড়ীর পর বাড়ী; নীচেকার ছবিতে : দলে দলে আবালবৃদ্ধবনিতা—ফরাসী এলাকায় আশ্রয়প্রার্থী।—

"কাকাবাবু!"

"কে, নান্নু?" সুবিমলের চমক ভাঙ্গে।

নান্নুর হাতে অদ্যকার ষ্টেটস্‌ম্যান। মেন্ পেজের মানচিত্রখানি দেখাইয়া কহিল, "ফ্রাঙ্কো যে প্রায় সবই দখল করে নিলে! তুমি আমায় মিথ্যে কথা বলেছিলে তবে। এই দ্যাখো, কালো দাগের জায়গাগুলি সবই ফ্রাঙ্কোর—এই যে নীচে লেখা রয়েছে। তখন বাবা বলছিলেন!"

সুবিমল কি জবাব দিবে ভাবিয়া পায় না। সকালে সে সত্য কথা গোপন করে নাই, নান্নুই বুঝিতে ভুল করিয়াছে—বুঝিবার বয়স এ নয়। বলিল, "এখনো তো শত্রুপক্ষ ম্যাড্রিডে ঢোকেনি—আর ঢুকলেও ভাবনার

কী বল্। ওদেশেই দেখবি আবার একদিন যুদ্ধ হবে—তখন জেনারেল ফ্রাঙ্কোর দলই হেরে যাবে। তা ছাড়া আরো কত দেশ আছে—তারা ফ্রাঙ্কোকে চায় না।"

মাদ্রিদের আসন্ন পতনের সম্মুখে এই ফাঁকা সান্ত্বনায় মানু খুশি হয় না—তার কাকারও মনে ফাঁকি ধরা পড়ে সঙ্গে সঙ্গে।

বোঁ-ও-ও-ও......

কলিকাতার মাথার উপর দিয়া একখানি এরোপ্লেন উড়িয়া চলিয়াছে।

নানু ও তার কাকাবাবু জানালায় আসিয়া দাঁড়াইল। এরোপ্লেনখানি উড়িয়া আসিতেছে দমদমের দিক হইতে—শোঁ-ও-ও-ও......

"কাকাবাবু, এই এরোপ্লেন্ বোমা মারতে পারে?"

"সে সব আলাদা প্লেন্। আর, এরা মারবে কেন?—এখানে তো যুদ্ধ হচ্ছে না।"

"তা বুঝি বলছি! যেখানে যুদ্ধ হচ্ছে, সেখানে কি এরকম এরোপ্লেন থেকেই বোমা ফেলে, না এর চেয়েও বড়?"

"বড়ও আছে, এর চেয়ে ছোটও থাকে।"

উড়ো-জাহাজখানি এখনো দৃষ্টির বাহিরে যায় নাই। উৎকট আওয়াজ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে।

নানু খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "কাকাবাবু, স্পেনের বেশি এরোপ্লেন্ না থাকার জন্যই তো ওরা হেরে যাচ্ছে, না? নইলে কি আর ফ্রাঙ্কো পারত! ফ্রাঙ্কোকে কত ভাল ভাল এরোপ্লেন দিয়েছে জার্মাণী আর ইতালী, তাই না ওর এত চোট।"

"হুঁ"—সুবিমল ভ্রাতুষ্পুত্রের রাজনীতি জ্ঞানের তারিফ করিল মনে মনে।

এবার কিন্তু নান্নুর প্রশ্ন কানে যায় না—চোখ পড়িয়াছে টেবিলের উপরে। পিক্‌চার পেজের সেই ছবি কয়টি—ঊর্ধ্বে একঝাঁক বোমারু-বিমান, নিম্নে ফরাসী সীমান্তে আশ্রয়প্রার্থী নরনারীর ভিড় !

আবার, বোঁ-ও-ও-ও !

উড়ো-জাহাজখানি এক চক্কর দিয়া ফিরিল বুঝি !

দুইজনেই আবার জানালার কাছে আকাশের দিকে চাহিয়া আছে এমন সময়—

ঊর্দ্ধশ্বাসে আন্নু ঢুকিল ঘরে। হাতে তার গণতান্ত্রিক স্পেনের শেষ নিঃশ্বাস। এক পয়সার স্পেশাল বাহির হইয়াছে এইমাত্র। বাবা বাসায় নাই, মাকে শুভ সংবাদটা দিয়াই আন্নু ছুটিয়া এ-ঘরে আসিয়াছে নান্নু আর কাকাবাবুকে দেখাইতে। হাতে তার জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে কালো মোটা অক্ষরগুলি—ব্যানার লাইন: INSURGENTS ENTER MADRID !!!

আন্নু পরক্ষণেই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল—কাগজখানি কিন্তু ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে কাকাবাবুর জন্য। এক অপরিণতমনা তরুণ কিশোর—তার ইচ্ছার জয় হইয়াছে। কাকা মনে মনে হাসে। নান্নুর মুখে কথা নাই।

ঐ ব্যানার হেডিংটা কিন্তু এক ব্যক্তিগত গুরুতর ক্ষতির মতই আজ সুবিমলকে আঘাত দিয়াছে—বিশেষতঃ, তারই প্রশ্রয়—পরিপুষ্ট আর একটি তরুণ মনও যখন কাকাবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া আছে দারুণ নৈরাশ্যে।

নান্নুও এবার আস্তে আস্তে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল—

কাকার মনের অবস্থাটা সে নিজের মন দিয়াই যেন বুঝিতে পারিয়াছে।

দৃশ্যটা সুবিমলের মনে খচ্‌ করিয়া বিঁধে। বস্তুতঃ, এর মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টার নানু জড়িত না-থাকিলে সাগরপারের রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্য্যয় তাকে এমনভাবে অভিভূত করিত না নিশ্চয়ই। বড় জোর একটা অনুকম্পার দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া হয় তো সে সন্ধ্যার শো-তে মেট্রো সিনেমায় টিকিট কাটিতে যাইত!......

সুবিমল সোজা উঠিয়া দাঁড়ায়। নিরাশ হইলে চলিবে না। এতদিন তবে নানুকে সে প্রেরণা দিল কিসের জোরে? সে বিশ্বাস নৈরাশ্য জানে না,—ভাঙ্গে তো মচকায় না!

কিন্তু...তবু... সদ্য ক্ষতিরও যে একটা শোক আছে, তাই তো নানুকে ডাকিয়া এখন সে ভবিষ্যতের নিশ্চিত আশার কথা শুনাইতে একেবারেই অপারাগ।.........

সুবিমল পায়চারি করে ঘরের মধ্যে। এ কেমন দুর্ব্বলতা! তবে কি এতদিনের বিশ্বাস তার নিছক একটা ভাববিলাস?............

দূর হইতে একটা আওয়াজ আসে কানে যেন বহুলোকের মিলিত কণ্ঠ। উড়োজাহাজের শব্দ নয়। বোধ হয় রাস্তার হল্লা।—চুরি, রাহাজানি, পকেট-মারা, মোটর অ্যাক্সিডেন্ট্‌—কলিকাতার রাজ-পথের কোন একটা উপদ্রব!............

শব্দটা ক্রমেই আগাইয়া আসিতেছে। ব্যাপার কি জানিবার জন্য সুবিমলের আজ কৌতূহল নাই। ভাবিতেছিল, কেমন করিয়া নানুকে আবার—

নান্নুই ছুটিয়া ঘরে ঢুকিল। মুখে-চোখে তার চাপা উল্লাস।

বিস্মিত সুবিমল ভ্রাতুষ্পুত্রের দুই আকস্মিক ভাবান্তরের কারণ জিজ্ঞাসা করিবার আগেই সে বলিয়া উঠিল, "কাকাবাবু, শিগ্গির জানালার কাছে চলো।"

"কেন ?"

"শুন্‌ছ না ?"

"কী ?"

"দেখবে চল"—নান্নু কাকার হাত ধরিয়া রাস্তার উপর জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

ইন্‌ক্লাপ্ জিন্দাবাদ !...... ......

একটা শোভাযাত্রা।—টালীগঞ্জের দিক হইতে শ' পাঁচেক ধর্ম্মঘটী মজুর রসা রোড দিয়া গড়ের মাঠে চলিয়াছে।

নান্নুর মুখে আনন্দের চাপা হাসি। কি সে বুঝিয়াছে কে জানে ! সুবিমল শুধু একটা কথাই বুঝিল, মাদ্রিদের পতনে নান্নু পরাজয় মানে নাই !...

মজদুর কি জয় !.........

কাকা ও ভাইপোর অলক্ষ্যে সুলেখাও আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়াছে মজা দেখিতে—কোলে খোকা।

সুবিমলের দৃষ্টি নিবদ্ধ শোভাযাত্রার দিকে। এই মুহূর্ত্তে তারই চোখের সামনে যেন—ঘরে ও বাহিরে—অনতিদূর ভবিষ্যৎখানি ! নান্নুর হাত ধরিয়া একটা ঝাঁকুনি দিয়া কহিল—"কমরেড !"

পিছনে মায়ের কোলে খোকাও কাকাবাবুকে নকল করিয়া একবার দাদাকে ডাকিল, "কমলেদ !"

ইতর

প্রকাণ্ড হাসপাতাল।

বিপুল অর্থব্যয়ে বিরাট ব্যবস্থা। রাজপ্রাসাদের মত বড় বড় ইমারত। ছোটখাটো বাড়ীর সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। মাঝে মাঝে এক টুকরা মাঠ—চারিদিকের গায়-গায় লাগানো ইঁটের পাহাড়গুলির মধ্যে একটুখানি স্বস্তির নিঃশ্বাস যেন।

মহানগরীর হাসপাতালই বটে!

মেয়েদের আউট-ডোর ওয়ার্ড। আজ রবিবার। বেজায় ভীড়। প্রশস্ত হল-ঘরের সবগুলি বেঞ্চি দখল করিয়া ঠাসাঠাসি বসিয়া আছে নানান বয়সী মেয়েছেলে। পুরুষ সঙ্গীরা। পাশের বিশ্রামাগারে।

চুপচাপ বসিয়া থাকিতে আর কত ভাল লাগে! সবাই আমার অপরিচিত। সাধিয়া আলাপ করিতে নারাজ। সুতরাং মনে মনে আকাশ-পাতাল ভাবিতে ভাবিতে এক সময় সম্মুখের আকাশ-ছোঁয়া বাড়ীটার ছাতের দিকে চোখ চালাইয়া দিলাম। রোগীর কথা দূরে থাকুক, অত উঁচুতে খানিক চাহিয়া থাকিলে আমার মত সুস্থ সবল লোকেরই যে ঘাড় আড়ষ্ট হইয়া আসে! তন্ময় হইয়া মানুষের সেবাব্রতের

এই অতুল কীর্ত্তি দেখিতেছি এমন সময় চাপা গলায় গৃহিণী ডাকিল, "শুনছ ?"

"কী ?" ঘাড় ফিরাইলাম।

"এত করে নিষেধ করলাম, কথা আমার কানেও তুললে না। কতগুলো টাকার শ্রাদ্ধ হল তো !—এবার দেশে ফিরে চলো।"

"আবার তোমার কী হল গো ?"

"হবে আবার কী ! শিগ্‌গির হাসপাতালে ভর্ত্তি হবার কোন আশা নেই।"

"কেন ?"

"এক মাস দেড়-মাস ঘুরে ঘুরেও না-কি 'বেড' খালি পাওয়া যায় না।"

"কে বললে তোমায় ?"

"সবাই বলছে। তুমি তো সব খবরই রাখো ! এত করে বারণ করলাম আসবার আগে—"

"সে-সবাইটা কে, শুনি।"

শোভা হল-ঘরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "ঐ কোণের মেয়েটিকে দেখছ তো ?—ঐ যে লাল-পেড়ে কাপড়-পরা বৌটি ?"

"হুঁ"—অবশ্য দেখি নাই। তাহাকে দেখিবার আমার প্রয়োজন নাই। আপাততঃ গৃহিণীর উতলা হইবার প্রকৃত কারণটা সম্যক জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

শোভা বলিয়া চলিল, "—ওই মেয়েটি, আজ একমাস হয়ে গেল, এসে এসে কেবলি ফিরে যায়। তবু আজো নাকি 'বেড্‌' খালিই হয় না। —না, এমন জানলে কে আসত তোমার কলকাতায়। আমার ছেলে-

মেয়ে ফেলে রেখে আমি কিন্তু এদ্দিন থাকতে পারব না, তা আগেভাগেই বলে রাখছি।"

"তুমি পাগল না খ্যাপা! তা হ'লে লোকে হাসপাতালে ছুটে আসে কেন? ঐ বৌটির নিশ্চয়ই তেমন কিছু শক্ত ব্যারাম নয়—"

শোভা প্রতিবাদ জানাইয়া কহিল, "ওর যে কী……তা তোমাকে আর—যাক্, আমি ছেলেমেয়ে ছেড়ে এতদিন কলকাতায় কিছুতেই থাকব না।"

এবার একটু উষ্ণ হইয়াই কহিলাম, "এ তোমার চিরকেলে স্বভাব। একটুতেই উতলা হয়ে ওঠ। কে না কে আন্দাজে কী সব বললে, অমনি তুমি—"

বাধা পাইলাম। এতক্ষণ আমারই ডান পার্শ্বে চুপচাপ বসিয়াছিল যে লোকটি, হাতের আধ-পোড়া বিড়িটা ফেলিয়া দিয়া সে গলা ছাড়িয়া কহিল, "আপনার স্ত্রী ঠিক কথাই বলেছেন, মশায়!"

পরপুরুষের আকস্মিক মধ্যস্থতায় শোভা মাথায় একটু আঁচল টানিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। শত হইলেও পাড়াগাঁয়ের মেয়ে তো।

কিন্তু লোকটার ধৃষ্টতায় অবাক হইলাম। এক অপরিচিত দম্পতির জরুরী আলোচনার মাঝখানে এমন গায়ে-পড়িয়া আলাপের চেষ্টা আর যাহাই না হউক, ভদ্রতা নয় নিঃসন্দেহে।

লোকটা একটু কাশিয়া লইয়া কহিতে লাগিল, "আপনার স্ত্রী ঠিক কথাই বলেছেন মশায়! উনি যার কথা বললেন না, সে যে আমারই স্ত্রী। আজ এক মাস—রিকশা ভাড়ায়ও কোন্ আর দু'চার দশ টাকা খরচ হয়ে যায় নি, বলুন—তবু শালাদের এখনো বেড্ খালিই হয় না। চালাকি

পেয়েছে! এটা হাসপাতাল! ভেবেছে, চাবিকাঠির কোন খবরই আমরা রাখি নে। হুঁ, দেব সব কথা খবরের কাগজে তুলে—বুঝবে ঠেলা।"

আমি নিরুত্তর রহিলাম। এই লোকটি এতক্ষণ যে—বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিতেছিল তিনি গম্ভীরভাবে কহিলেন, "খবরের কাগজে লিখে কিছু হয় না।"

"হয় না মানে? আপনি কিছু জানেন না মশায়।" লোকটা যেন তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল: "জানেন, আমার এক সম্বন্ধীর খুড়তুতো ভাই খবরের কাগজের আফিসে কাজ করে। তাকে দিয়ে একটিবার ব্যাটাদের কাণ্ডকারখানার কথা ছাপিয়ে দিলে বুঝবে তখন কত ধানে কত চাল। মগের মুলুক পেয়েছে কিনা!"

ভদ্রলোক চুপ করিয়া গেলেন। বুঝিলাম, লোকটার মগজের গুটিকয়েক স্ক্রু বেশ ঢিলা। তবু তাহার নিস্ফল অভিযোগের সবখানিই আর বাড়ানো নয়! আসল ব্যাপার জানিবার ইচ্ছা আছে বটে; কিন্তু একটি অশিক্ষিত ছিটওয়ালা লোকের সঙ্গে আলাপ জমাইতে আমার শিক্ষিত অভিমানী মন নিতান্তই গররাজী। কলেজ-জীবন আমার মফঃস্বল সহরেই কাটিয়াছে। কলিকাতায় বার কয়েক না আসিয়াছি এমন নয়। হাসপাতালের ভিতরে যাইবার সৌভাগ্য কিন্তু আমার হয় নাই। পাড়াগাঁয়ের এক বে-সরকারী হাইস্কুলের স্বল্পবেতনের শিক্ষক। শুধু জানি, দরিদ্র, মধ্যবিত্তের কাছে ব্যয়বহুল আধুনিক চিকিৎসার পুরাপুরি সুযোগ-সুবিধা মিলে একমাত্র হাসপাতালেই। অথচ এ-লোকটা বলে কি!

লোকটির মুখে যেন তপ্ত খোলায় খৈ ফোটে অজস্র। খানিক বাদে

আমার সংযমের বাধ ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার অনর্গল কথার স্রোতে বাধা দিয়া প্রশ্ন করিলাম, "আপনাকে এক মাস ধরে ঘোরাচ্ছে কেন?"

"কেন মানে? আপনি তো বেশ ভদ্রলোক!—"

"না, এই, আপনি বলছিলেন কিনা আজ এক মাস ধরে—" লোকটা আমার মুখের কথা কাড়িয়া নিল। "তবে কি মিথ্যে বলছি মশায়? জিগ্‌গেস করুন না ঐ ভদ্দলোককে, উনিও আজ দিন পনের ওঁর বিধবা মেয়েকে ভর্ত্তি করাবার জন্য বার বার এসে ফিরে যাচ্ছেন। কি মশায়, মিথ্যে বলছি?"

ভদ্রলোক সায় দিল কি দিল না সেদিকে লোকটার ভ্রুক্ষেপ নাই। তেমনি এক নিঃশ্বাসে বলিয়া চলিল, "গেল রোববার বললে, আসছে বুধবার নিশ্চয় ভর্ত্তি করাবে; বুধবার বললে, শনিবার; আজ শনিবারও ঠিক এক কথাই বলবে—দেখে নেবেন স্যার।"

এবার একটু থামিয়া সে বিড়ি ধরাইল। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি মন্তব্য করিলেন, "খাতিরে কী না হয়, বলুন। এরি মধ্যে কত জন পরে এসেও এ্যাড্‌মিশন পেয়ে গেল, চোখের উপর তো দেখলাম।"

বিড়ি টানিতে টানিতে লোকটা আবার রুখিয়া উঠিল, "সবুর করুন, মশায়। আর দুচা'র দিন দেখে খবরের কাগজে উঠিয়ে দেব।" তারপর আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "কী বলব মশায়। আজ নিয়ে বাইশ দিন। ইদিকে রোগীর তো প্রায় দফা রফা। ঘরে মশায় চার চারটে আণ্ডাবাচ্চা। দেখুন না ব্যাটাচ্ছেলেদের কাণ্ড।"

একটু করুণা হইল। তাহার এতখানি বাক্য—বর্ষণের পর এখন একটা

কিছু না বলিলে নেহাৎই খারাপ দেখায়। কহিলাম, "তা হলে শুধু আপনাকেই নয়, সকলকেই এমনি করে বুঝি—"

"সবাইকে ঘোরাবে কেন মশায়?" আমার কথায় বাধা দিয়া লোকটি তাচ্ছল্যের হাসি হাসিয়া কহিল, "আপনি দেখছি মশায় কিছুই জানেন না।— কোন খবরই রাখেন না। সবাইকে ঘোরাতে যাবে কেন! আসল কথা— এই—এই চাই," বলিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর সংযোগে এক প্রকার আওয়াজ তুলিয়া টাকার ইঙ্গিতটা সুন্দর করিয়া বুঝাইয়া দিল।

লোকটির ঘন ঘন 'মশায়' সম্বোধন লাগে বেশ বলিবার ভঙ্গীটাও উপ-ভোগ্য। তাহার একটানা কথার কতক শুনিয়া আর কতক না শুনিয়া সময়টা আমার কাটিয়া যাইতেছিল মন্দ নয়। আর কি-ই বা করি। কতক্ষণে যে শোভার ডাক পড়িবে। সবে তের নম্বর। চৌত্রিশের ডাক উঠিতে অনেক দেরী।

খানিকবাদে লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, "মশায়ের বুঝি স্ত্রীর অসুখ?

"হ্যাঁ।"

"আমারো।"

বেশ তো! চুপ করিয়া রহিলাম।

"নিবাস?"

"মূলহাটা—পাবনা জেলায়।"

উত্তর দিয়াই তাড়াতাড়ি সেদিনের ভাজকরা 'আনন্দবাজার'-খানি খুলিয়া লইলাম। তবু সে প্রশ্ন করিল, "মশায়ের নামটা কী?"

সংবাদপত্রের স্তম্ভ হইতে মুখ না তুলিয়াই জবাব দিলাম, "রমানাথ মিত্র।"

"বেশ, বেশ!—আপনি তা হলে আমার স্বজাতি। আমিও মশায় কায়েত। আমার নাম শ্রীলোকনাথ দে।"

লোকনাথই হউক আর বিশ্বনাথই হউক, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু এ কি বেয়াদবি! লোকটি আমার বাহিরের পরিচয় লওয়া সাঙ্গ করিয়া হাঁড়ির খবর লইতে অতি-মাত্রায় ব্যগ্র হইয়া উঠিল। কহিল, "মহাশয়ের কী করা হয়?"

"মাষ্টারি"

"হেড মাষ্টার?"

"না।"

"মাইনে কত?"

ধৃষ্টতা কম নয়। তবু জবাব দিলাম, "চল্লিশ টাকা"।

"আমারও মাইনে চল্লিশ টাকা।"

ভাল কথা! মুখ ফিরাইয়া লইলাম। তবু নাছোড়বান্দা লোকনাথ দে থামিবে না। আবার প্রশ্ন, "বাপ-মা বেঁচে আছেন?"

"না।"

"আমারো নেই মশায়।"

বিরক্তি গোপন করিয়া আবার সংবাদপত্র পড়িতে বসিলাম। খানিকবাদেই আবার বাধা।

"মাপ করবেন মশায়। আপনার নাম না কী বললেন?"

"রমানাথ মিত্র।"

"এই দেখুন স্যার নাথে-নাথে মিলে গেছে—"বলিয়া লোকনাথ উল্লসিত হইয়া উঠিল।

আচ্ছা বিপদ! কিছুতেই সে থামিবে না। আমি এবার সশব্দে খবরের কাগজ পড়া সুরু করিলাম। তবু—

"আপনার ছেলেমেয়ে ক'টি ?"

"দুটি ছেলে, একটি মেয়ে।"

"কলকাতায় সঙ্গে নিয়ে এসেছেন ?"

"না"।

"সে কি মশায়! মা ছেড়ে ছেলেপেলে অদ্দিন কেমন করে থাকবে ?"

যেমন করিয়াই থাকুক, তাহাতে লোকনাথের অত মাথা ব্যথা কেন! অসহ্য বোধ হয়। তবু চুপ করিয়া রহিলাম। লোকনাথ দে, সুতরাং কায়স্থ সে, ভদ্র সন্তান সন্দেহ নাই। লেখাপড়া জানা যাহাকে বলে সে-পাট যে তাহার ছোটবেলাই খতম হইয়াছে, তাহা তো অতি-প্রত্যক্ষ। না-ই বা জানিল। সবাই শিক্ষিত হইবে আজো এমন কোন বিধান নাই। তাই বলিয়া এ কেমনধারা শিষ্টতা! মানুষকে অমন অতিষ্ঠ করিয়া না-তুলিবার ভদ্রতাজ্ঞানটা তাহার একান্তই থাকা উচিত ছিল। রাগ দেখাইবার মত পরিচিত নয়; সুতরাং চুপ করিয়া যাওয়া ছাড়া আর উপায়ই বা কি!

লোকনাথ একথা সেকথা নানাকথা শেষ করিয়া অবশেষে আবার আমাকে স্মরণ করাইল, "কাজটা কিন্তু ভালো করেন নি, রমানাথবাবু! ছেলে-মেয়ে ক'টিকে নিয়ে আসাই উচিত ছিল। ওতে আর কত টাকাই বা লাগত। আপনার স্ত্রীকে ভর্ত্তি হ'তে কদ্দিন দেরি হবে কে বলতে পারে! আমরা আগে যারা এসেছি, তাদের সব হবে, তবে তো আপনাদের পালা। মা ছেড়ে ছেলেমেয়েরা না জানি কত কষ্ট পাচ্ছে।"

লোকনাথের অযাচিত উপদেশের কবল হইতে রেহাই পাইলাম। চৈত্রিশের ডাক উঠিয়াছে।

সেদিনের মত শোভাকে লইয়া বাহির হইয়া আসিতেছি। পিছন হইতে লোকনাথ ডাকিল, "ও রমানাথ বাবু!"

ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। সঙ্গে একটি আধ-ঘোমটা মেয়ে। বুঝিলাম লোকনাথের স্ত্রী। মুখখানি ভালো দেখা গেল না। ইতিমধ্যে আমাদের দু'জনকে পিছন করিয়া উভয় পক্ষের গৃহিণী সংলাপ সুরু করিয়াছে। লোকনাথের স্ত্রীর সস্তা শাঁখার-চুড়ি-পরা একখানি হাত দেখিয়াই তাহার দীর্ঘকাল রোগভোগের খানিকটা পরিচয় পাওয়া গেল।

"বলছিলাম না লোকনাথবাবু, আজো শালারা সে কথাই বলবে। সামনের বুধবার নাকি হবেই হবে। দেখা যাক।—আপনায় কী বললে?"

"আমাদেরও সামনের বুধবার অসতে বলে দিলেন!—আবার পরীক্ষা করাতে হবে।"

লোকনাথ হাসিয়া কহিল, "কত বুধবার আসবেন এখন থেকে—চিন্তা কি!"

লোকনাথ আরো অনেক কথা বলিয়া গেল। আমি কিন্তু শুনিতে-ছিলাম পিছনের অনুচ্চ কণ্ঠের আলাপ।

"কথায় বলে না দিদি, পথিকে পথিকে পথের আলাপন।"

শোভা কহিল, "ঠিক বলেছ ভাই, এত লোকের মধ্যে তোমার সঙ্গেই বা আলাপ হবে কেন!"

"কে জানে, আর জন্মে তুমি হয় তো আমার মায়ের পেটেরই বড় বোন ছিলে।"

"তাই তো এক ঘর লোকের মধ্যে তোমায় চিনে নিলাম। কৈ, আর কারু সঙ্গে তো পরিচয় হল না।"

কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। রেল-ষ্টিমারে শোভাকে কত মেয়ের সঙ্গেই না এমনধারা কুটুম্বিতা পাতাইতে দেখিয়াছি। এতগুলি মায়ের পেটের বোনের পূর্ব্বজন্মের গর্ভধারিণী নিশ্চয়ই গান্ধারীর স্বজাতীয়া ছিলেন। শোভাদের উপভোগ্য কথাবার্তার মাঝখানে বেয়াড়া বেরসিক লোকনাথ বিড়ির কৌটা খুলিয়া ধরিল, "নিন—একটা বিড়ি ধরান।"

"আমি খাই না।"

"বেশ, বেশ! ও বদ অভ্যেস না করাই ভাল। আমাদের রাত-জাগা কাজ কি না। নেশাটা-আশটা না করলে আর চলে না মশায়।"

"আচ্ছা, এখন তবে—"

"নমস্কার, আবার আসছে বুধবার দেখা হবে।"

ওদিকে শোভা কহিল, "তবে আজ যাই বোন।"

"একদিন আমাদের বাসায় কিন্তু যেতে হবে দিদি।"

"আচ্ছা, সে পরে হবে।"

শোভাকে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিতে যাইয়া দৃষ্টি পড়িল লোক-নাথের স্ত্রীর পাণ্ডুর মুখের উপর। তাহার ক্ষীণ দেহটি ঘিরিয়া ব্যাধির কাতর কুশ্রীতা। তবু কোঠরস্থ ডাগর চোখদুটি হইতে নিকট-দিনের এক পূর্ণশ্রীর সকল সাক্ষ্য এখনো একেবারে মুছিয়া যায় নাই।

"একদিন আমাদের ওখানে কিন্তু যেতেই হবে", বলিয়া সে অস্থিচর্ম্মসার ডান হাতখানি দিয়া মাথার আঁচল আর একটু তুলিতে তুলিতে একগাল মিষ্টি হাসির ব্যর্থ চেষ্টা করিল।

রিক্‌শা চলিয়াছে ঠুন্‌ঠুন্‌। লোকনাথের স্ত্রীর অসহায় অবস্থার কথাই বুঝি ভাবিতেছিলাম! শোভা জানাইল, "লক্ষ্মী মেয়েটি বেশ।"

"লক্ষ্মী কে?"

"বা-রে! এতক্ষণ না ওর বরের সঙ্গে বসে বসে আলাপ করলে।"

"হুঁ"।

তারপর গৃহিণী সবিস্তারে অনেক কথাই শোনাইল। ধন্য এই মেয়ে জাতটা! দু'দণ্ডের পরিচয়েই একবারে গলাগলি ভাব। শোভার জিম্মায় এখন লোকনাথের সংসারের সকল তথ্য জমা আছে। লোকনাথ কোন্‌ এক ছাপাখানায় কাজ করে। সে নাকি যত সব বই ছাপায়। বুঝিলাম, কম্পোজিটর সে। মাহিনা পায় পঁচিশ টাকা। বেলেঘাটায় কি একটা গলিতে তাহাদের বাসা। লক্ষ্মীর ছেলেমেয়ে চারটি। বয়সে সে শোভারাণীরও ছোট। অতএব চব্বিশের বেশী নয়। বছর দুই নানা রোগে ভুগিতেছে। আবার নাকি অন্তঃসত্ত্বা। বাপের কুলে বড় একটা কেউ নাই। ইত্যাদি ও ইত্যাকার অনেক সংবাদ অবগত হইলাম। শুধু কি তা-ই! শোভা যেন আপন মনেই বলিয়া চলিল, "বেলা আর মণি প্রায় সমান। মাঝে লক্ষ্মীর একটা কাঁচা গেছে, নইলে তো আমার পল্টুর বয়সীই হত গো।" বুঝিলাম, লোকনাথেরও একটি নয় বছরের মেয়ে আছে; এবং, বিধাতা বাদ না সাধিলে, যথা সময়ে ভূমিষ্ঠ হইয়া এতদিনে সাত বছরের আর একটি ছেলেও থাকিত।

এত কথা, এত কাণ্ড! আর আমি কিনা শোভারাণীর পূর্ব্বজন্মের

মায়ের পেটের বোনটির স্বামীটিকে এতক্ষণ মনে মনে অবহেলা করিয়া আসিলাম !

আমার ভাগ্য ভাল। পরদিন সন্ধ্যাবেলা হেদুয়ায় বহুকাল পরে এক পুরাণো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। সকল কথা শুনিয়া লোকনাথের মতই হাসিয়া কহিল, "তুমি দেখছি কিছুই জান না।"

যাহা হউক্, বন্ধুর নিকটে আটঘাটের কথা জানিয়া লইলাম এবং পরদিন দুপুরবেলা শোভাকে লইয়া ল্যান্সডাউন রোডে ডাঃ চক্রবর্ত্তীর বাসায় গেলাম। বাড়ীতে ডাকিলে ডাঃ চক্রবর্ত্তীর ষোল টাকা ভিজিট আর বাসায় নিয়া দেখাইলে আট টাকাতে হয়।

ডাঃ চক্রবর্ত্তী বলিয়া দিলেন, রোগ তেমন সিরিয়স নয়, তবু ইন্-ডোরে ভর্ত্তি করাইতে হইবে এবং বুধবার দিন রোগিনী যেন ভর্ত্তির জন্য প্রস্তুত হইয়াই হাসপাতালে যান। তথাস্তু।

বুধবার যথাসময়ের বহু আগেই সস্ত্রীক হাসপাতালে হাজির হইলাম। ডাঃ চক্রবর্ত্তী তখনো আসেন নাই। সন্ধান লইয়া জানিলাম তাঁহার আসিতে আজ ঘণ্টাখানেক দেরী হইবে। তবু, বন্ধুবরের পরামর্শ অনুযায়ী ডাঃ চক্রবর্ত্তীর না আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব। ডাঃ চক্রবর্ত্তীও বলিয়াছেন, তিনি আসিয়া আর-এম-ও'র সঙ্গে দেখা করিয়া আজই তাঁহার নিজের ওয়ার্ডে ভর্ত্তি করিয়া নিবেন। দেরী হউক আপত্তি নাই। আজ আমি নিশ্চিন্ত মনে আসিয়াছি। আট টাকার ফলপ্রাপ্তি অবধারিত।

ইতিমধ্যেই রীতিমত ভীড় জমিয়াছে। আজ আবার কত অচেনা মুখ। অকাল মাতৃত্ব আর অতিমাতৃত্বের হরেক নমুনা!

লোকনাথ সেদিনের জায়গাটিতে বসিয়া আছে চুপচাপ। এই কয়দিনে ঐ বেঞ্চিটায় তাহার বুঝি দখলিস্বত্ব জন্মিয়া গিয়াছে। আমাকে দেখিয়াই এক গাল হাসিয়া সোল্লাসে কহিল, "এই যে রমানাথ বাবু, ইদিকে—এখানে এসে বসুন।—কতদিন এমনি আসতে হবে মশায়!—সবে সুরু।"

তাহার কথা শুনিয়াই আজ কিসের জন্য মনে মনে যেন সঙ্কুচিত হইয়া গেলাম। লোকনাথের সাদর সম্ভাষণ আজ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। আজ তাহাকে বন্ধু বলিয়া মানিতে আমার দ্বিধা নাই বুঝি। পাশেই বসিয়া পড়িয়া কহিলাম, "আপনার স্ত্রীকেও বোধ হয় আজই ভর্ত্তি করে নেবে—"

"আরে মশায়, আমার ভাবনা আমি ভাবব। আগে নিজের কথাটাই ভাবুন। এই তো সুরু। কত আসবেন এখন থেকে।"

লোকনাথের কথা শুনিয়া খচ করিয়া আজ মনের কোণে কোথায় যেন বিঁধিল। অপরাধীর মত চুপ করিয়া রহিলাম। আমাকে আনমনা দেখিয়া লোকনাথ সান্ত্বনার কথা সুরু করিল, "ভাবছেন কী মশায়?"

"কিছু না।"

"হুঁ"—লোকনাথ হাসিয়া উঠিল, "প্রথমটায় অমনি হয় মশায়। ভেবেছিলেন, কলকাতায় পৌঁছেই সরাসর হাসপাতালের বিছানায়। এবার বুঝুন।"

চুপ করিয়া রহিলাম। সকল কথা খুলিয়া বলিতে কোথায় যেন

লাগে। লোকনাথ একমাস ধরিয়া ঘুরিতেছে। তাঁর স্ত্রীর অবস্থাও সঙ্গিন। আমি অবশ্য লোকনাথ নই। যে সামান্য অর্থ লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছি তাহা ফুরাইলে শোভারাণীর গলার সরু চেনটায় অন্ততঃ গোটা ষাটেক টাকা তো মিলিবেই। তবু আমাদের কল্যকার কথাটা লোকনাথকে মুখ ফুটিয়া বলা চলে না। অথচ কেন যে বলা চলে না তাহারও সদুত্তর খুঁজিয়া পাই না। অপরাধটা আমার, না তার, না কার? লোকনাথের কাছে আজ এমন অপরাধীর ভাব লইয়া-ই বা বসিয়া আছি কেন? আমাকে নীরব দেখিয়া লোকনাথ সুরু করিল—

"মশায়,এত লেখাপড়া শিখেছেন,খবরের কাগজে চুটিয়ে লিখে দিন না ব্যাটারা চাকরির মায়ায় বাপ বাপ করে লাটের দোরে ধরনা দেবে।"

আস্তে আস্তে কহিলাম, "লিখে কিচ্ছু হয় না, লোকনাথবাবু।" চাহিয়া দেখিলাম, আমার 'লোকনাথবাবু' সম্বোধনে তাহার মুখেচোখে এক ঝলক খুশির হাসি ফুটিয়া উঠিল।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি এবার মুখ খুলিলেন, "হাসপাতাল বলে কেন মশায়, সব জায়গায়ই এক।"

আর যায় কোথায়! লোকনাথ সবিস্তারে তাহাদের ম্যানেজারের শ্রাদ্ধ করিতে বসিল। আমি এক অস্বস্তিকর মনোভাব লইয়া বসিয়া আছি। এখন ডাঃ চক্রবর্ত্তি আসিয়া পড়িলেই বাঁচিয়া যাই।

জন কয়েক কায়দাদুরস্ত ছোকরা-ডাক্তার শশব্যস্তে ইতস্ততঃ আনা-গোনা করিতেছে। চলায় বলায় মুখেচোখে এক মুখোস-পরা গাম্ভীর্য্য। রোগীর দল যে তাহাদের কৃপার উপরেই নির্ভর করিয়া আছে সে-কথাটা যেন তাদের সারা অঙ্গ দিয়া ঠিকরাইয়া পড়ে ক্ষণে ক্ষণে।

লোকনাথের অনর্গল বক্তৃতার মাঝখানে পাঁচ ছয় বছরের একটি মেয়ে আসিয়া তার কোলে বসিল। সেদিকে তাহার ভ্রুক্ষেপ নাই। বলিয়া চলিয়াছে, কবে আহাদের প্রেসের কম্পোজিটর সব একযোগে ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। ম্যানেজারের তর্জ্জন-গর্জ্জন! কম্পোজিটরদের আস্ফালন। অবশেষে আবার তাহারা কাজে লাগিল ভালো ছেলের মত।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি এখানে প্রশ্ন করিলেন" "আপনিও কাজ আরম্ভ করলেন?"

"আমি তো আর কাজ ছাড়ি নি।"

"ও, আপনি ষ্ট্রাইকে যোগ দেন নি।"

"খেপেছেন মশায়! চার চারটি ছেলেমেয়ে, শেষকালে সকল গোষ্ঠী শুকিয়ে মরি আর কি!"

ভদ্রলোক হাসিলেন। হাসিল লোকনাথ নিজেও। আমি কিন্তু এতক্ষণ রোগা মেয়েটির দিকে তাকাইয়া ছিলাম।

"এটি আপনার মেয়ে?"

"হ্যাঁ। আজ ওদের সবাইকে নিয়ে এসেছি। কি জানি আজ যদি ওকে ভর্ত্তি করে, তবে রোববারের আগে তো হাসপাতাল-মুখো হ'তে পারব না।"

কথাটা আবার মনে খচ্ করিয়া বিঁধিল। মেয়েটি আমার দিক হইতে চোখ ফিরাইয়া পিতাকে কহিল, "বাবা মাসিমা পুঁটিকে একখানা রোমাল দিয়েছে, দেখবে?"

"পুঁটি কিরে, দিদি বল্" বলিয়া লোকনাথ আমার দিকে চাহিয়া হাসিল। আমাদের উভয় পরিবারের মধ্যে যে একটা সম্বন্ধ গড়িয়া

উঠিয়াছে সেই কথাটা অমন মুখর লোকনাথও শুধু খুশির হাসিতেই প্রকাশ করিতে চায়। খানিক বাদে হাসিয়া হাসিয়া কহিল, "পুঁটির মার টেষ্ট আছে, কি বলুন স্যার? নইলে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে"—

"পুঁটি বুঝি আপনার বড় মেয়ে?"

"হঁ্যা,—আন্না, তোর দিদিকে আসতে বল্‌তো—তোর মেসোকে পেন্নাম করে যাক।"

একটু বাদেই আট নয় বছরের একটি মেয়ে আসিয়া হাজির। লোকনাথ কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিল, "বুড়োধাড়ি মেয়ে, তবু তোর বুদ্ধি হল না এখনো! তোর মেসোকে পেন্নাম করেছিস?"

মেয়েটি লজ্জিত হইয়া আমার পায়ের ধূলা লইল। দেখাদেখি তাহার ছোট বোনটিও।

তাহারা চলিয়া যাইতেই লোকনাথ হাসিতে হাসিতে কহিল, "ওদের মা কাল রাত্তিরে কী স্বপ্ন দেখেছে, শুনবেন? আজ ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে আমায় বলে, হাসপাতালে পাশাপাশি দুট' বিছানায় ওরা দুজনে নাকি শুয়ে শুয়ে গল্প করছে, আর আমরা দুজনে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাস্‌ছি।—হাসছেন কি মশায়, শেষ রাত্তিরের স্বপ্ন! ফলতে কতক্ষণ।"

আমি আগে হাসি নাই। বরং একটু বিরক্তি বোধ করিতেছিলাম। খানিক আগে আমার সৌভাগ্যের জন্যই লোকনাথের উপর একটু করুণা জাগিয়াছিল মাত্র। কিন্তু সে যে আমাকে সর্ববিষয়ে তাহার সমতুল্য করিয়া লইবে এতখানি উদারতা আমার নাই। হাসপাতালের

দুয়ারে স্বপ্নের মধ্যেও আমি তাহার সঙ্গে গলাগলি ধরিয়া হাসাহাসি করিতে একেবারেই নারাজ!

আমাকে আনমনা দেখিয়া লোকনাথ কহিল, "রমানাথবাবু, পুটির বিয়েতে কিন্তু আপনাদের কলকাতায় আসতে হবে, আগে থেকে বলে রাখছি। ওর মা কাল বলছিল—"

"মা তোমায় ডাকছে বাবা—" মেয়েটি আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। লোকনাথ উঠিয়া পড়িল।

খানিকবাদে ফিরিয়া আসিয়াছে। মুখের ভাব অসম্ভব রকম গম্ভীর। কথা বলিতে গেলাম, মুখ ফিরাইয়া নিল। বুঝিলাম, আমি এতক্ষণ যে কথাটা গোপন করিয়া আসিয়াছি, শোভার নিকট হইতে সে কথা এখন লোকনাথের কাছে তাহার স্ত্রীর মারফৎ পৌঁছিয়াছে। খানিকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে কহিলাম, "লোকনাথবাবু—"

লোকনাথ এতটুকু সাড়া দিল না।

"আপনাকে একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, কাল সন্ধ্যাবেলা এক বন্ধুর সঙ্গে—"

লোকনাথ যেমন ছিল তেমনি আছে। তবু একটু থামিয়া আবার কহিলাম।" একবার খোঁজ নিন না, আপনার স্ত্রীও আজ নিশ্চয় এ্যাডমিশন্ পাবেন।"

লোকনাথ নির্ব্বাক। তবু একবার স্মরণ করাইলাম, "আপনার স্ত্রীর শেষ রাত্রের স্বপ্নের বাকি অর্দ্ধেক নিশ্চয়ই ফলবে—।"

লোকনাথ বিড়ি ধরাইল। তাহার অস্বাভাবিক মুখের ভাব দেখিয়া আর অগ্রসর হইতে সাহস হইল না। মনে মনে হাসিলাম, করুণার

হাসি। আমার খানিক আগের অমন মুখর বন্ধুটি হঠাৎ যেন বোবা বনিয়া গিয়াছে। লোকটা অভিমান করিল কাহার উপর? আমি? ডাঃ চক্রবর্ত্তী? আটটি রৌপ্য মুদ্রা? গোটা হাসপাতাল? না, সারা দুনিয়া? না, নিজেরই দুরদৃষ্ট?—বোধ হয় আলাদা করিয়া কোনটাই নয়, সবগুলি জড়াইয়া এক অবোধ্য অভিমানে সে গুম হইয়া আছে।

আসল সমস্যা তো ল্যান্সডাউন রোডেই সেদিন সমাধান হইয়া রহিয়াছিল। সুতরাং দেরী হইল না। কয়েক মিনিটেই সকল ব্যবস্থার হুকুম হইয়া গেল। এখন শোভা সামনের এই মাঠটুকু পার হইয়া ঐ বিরাট লাল রঙের বাড়ীতে গেলেই হয়।

সিঁড়ির মুখেই লক্ষ্মী তাহার ছেলেমেয়ে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। শোভাকে দেখিয়াই কহিল, "দেখা না করেই চলে যাচ্ছিলে বুঝি?"

"সে কি বোন! আমি তো হল-ঘরে তোমার খোঁজ করে এই আসছি।—তোমার আজ হ'ল না?"

লক্ষ্মী চুপ করিয়া আছে। আজ তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। পরণে সেদিনের সেই আধ-ময়লা শাড়িখানি। গায়ে একটি রঙিন সেমিজ। এক মাথা রুক্ষ চুল; সিঁথিমূলে জ্বলজ্বল করে সিঁদুর। গণ্ডস্থল ভাঙ্গিয়া নামিয়াছে। কণ্ঠাস্থি বেয়াড়া রকমে জাগিয়া উঠিয়া ডাক্তারি-বই-এ-দেখা মনুষ্য-কঙ্কালের ছবিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। আরো ঢের আগে হাসপাতালে আসা উচিত ছিল। এখনো বুঝি আশা আছে।

আমি একটিবার চতুর্দ্দিকের বিরাট ইমারতগুলির উপর চোখ বুলাইয়া লইলাম। হাসপাতালকে কেন্দ্র করিয়া আমার চোখের সম্মুখে তখন সারা দুনিয়াটা তার সকল জারিজুরি লইয়া বার কয়েক যেন ঘুরপাক খাইয়া লইল।

লক্ষ্মী কহিতেছিল "কী কপাল নিয়েই জন্মেছিলাম দিদি, আমারো ভোগান্তি, ওরও শান্তি নেই। রাত-জাগা কাজ, আমার অসুখের জন্য ওভারটাইম খাটে—দিনের বেলাও যদি একটু চোখ বুজতে না পারে—"

লোকনাথ পিছন হইতে রুক্ষস্বরে হাঁকিল "পুটি তোরা কি আজ সারাদিন এখানেই থাকবি! বাসায় যেতে হবে না?"

লক্ষ্মী জবাব দিল "আদিকেতা ত্যাখ না। এতক্ষণ বসে রইলে, আর দুমিনিটে ব্রহ্মাণ্ড যেন রসাতলে যাবে।"

লোকনাথ রুখিয়া উঠিল, "তোমার আর গায়ে লাগবে কী!—আমি শালা নাওয়া নেই খাওয়া নেই, কেবল ডাক্তারখানা আর হা[illegible] [illegible]াল করছি।"

লক্ষ্মী স্বামীকে উপেক্ষা করিয়াই শোভাকে কহিতে লাগিল, "দেখ্‌ছ তো দিদি, কী সুখে আমি ঘর করি। তার দু'মিনিট দাঁড়ালে ওর—"।

লোকনাথ তিড়বিড় করিয়া উঠিল, "আমি চল্‌লাম। তুমি এখানে বসে বসে সারা রাজ্যের লোকের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে থাক।"

এবার লক্ষ্মীও ফোঁস করিয়া উঠিল, "ভদ্দলোকের সঙ্গে তো মেশ না, তাই কোথায় কী বলতে হয় তাও জান না।"

কথা আর শেষ হইল না। লোকনাথ গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "চুপ কর হারামজাদি! তোর কাছে আমি ভদ্দলোক ছোটলোক শিখতে যাব?"

গতিক ভাল নয়। লোকনাথ 'তুমি' থেকে 'তুই'এ নামিয়া আসিয়াছে ; তার মানে মানে সরিয়া না পড়িলে আরো কিছু শুনিতে হইবে।

শোভা তাড়াতাড়ি লোকনাথের ছোট ছেলেটাকে কোল থেকে নামাইয়া দিয়া আমার অনুসরণ করিল। একবার শুধু পিছনে ফিরিয়া দেখিয়া লইলাম, ছেলেমেয়ে লইয়া লক্ষ্মী সেখানেই দাঁড়াইয়া আছে নিষ্পলক চোখে, লোকনাথের ক্ষুব্ধ দৃষ্টিও আমাদেরই গমনপথে নিবদ্ধ!

শোভা মন্তব্য জানাইল, "লোকটা কী ইতর!"

আমি কেবল হাসপাতালের জমকালো বাড়ীগুলির উপর আর একবার চোখ দুটি বুলাইয়া লইলাম।

হাতেখড়ি

নীলিমার ছোট সংসারটি আজ উন্মনা। ব্যাপারটা ত আর যা-তা নয়। আজ তার একমাত্র সন্তান—সাত বছরের ছেলে বাব্‌লু—সর্বপ্রথম স্কুলে যাইতেছে।

বাব্‌লু কি আর সে-বাব্‌লু আছে! মা তাই বার বার ছেলেকে আজ তার ভাল নাম 'সুরজিৎ' বলিয়া ডাকিতে চায়। তবু, অভ্যাস দোষে, মুখ হইতে কেবলি খসিয়া পড়ে 'খোকন', নয় ত 'বাব্‌লু'। তা পড়ুক, তবু খোকা আজ নিঃসন্দেহে শ্রীমান্ সুরজিৎ রায়!

নীলিমা শশব্যস্ত। চাকরটারও সোয়াস্তি নাই—কেবলি ফরমাস। বাব্‌লুর হৃদয়ও দুরদুর করে আনন্দে আর আতঙ্কে। [illegible]ার যাহাই হউক বা না হউক্, মামারবাড়ী যে নয় এ-বোধ তার টনটনে। বাবার কাছে একটা বছর 'ঘোড়ায় চড়িল, আম খাইল' করিতে যাইয়া মাঝে মাঝে কিল-চড়টা বড় কম হয় নাই। তবু কোথায় যেন, কিসের যেন, প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে বছর সাতেকের অর্ধস্ফুট এক কিশোর মন।

সারা সকাল নীলিমার আজ ফুরসৎ নাই একটুকু। রান্নার কাজ ইতিমধ্যেই শেষ। খোকার ধোপদস্ত জামা-কাপড় কোঁচাইয়া গোছাইয়া

যথাস্থানে রাখিয়াছে বহুক্ষণ। খানিক কাজলও প্রস্তুত। ভৃত্য ভজুয়াকে দিয়া বিল্বপত্র, আম্রপল্লব আর ধান-দূর্বা যোগাড় করিয়া রাখিয়াছে। আজ তার, তার খোকার, আর তার বাবার জীবনে যে বিশেষ একটা দিন! সেই একরত্তি শিশু বাপ-মার সতর্ক চোখের উপর দিয়াই দেখিতে দেখিতে কবে যে বড় হইয়া উঠিয়াছে, সেই অতি-প্রত্যক্ষ নিঃশব্দ সত্যটা কেহ যেন জানিতেই পারে নাই। যাক্, নীলিমার খোকা সত্যই তবে বড় হইয়াছে! সম্মুখে তার এক অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যতের অস্পষ্ট পথ। আজ গৃহে তাই জয়যাত্রার মঙ্গলাচরণ!

"শুনছ?"

বিশ্বজিৎ শুনিয়াও শোনে না। স্ত্রী এবার আরও কাছে আগাইয়া যায়।

"তুমি ত আজ দেরি করে বেরুবে, না?"

"হুঁ"—নথিপত্র হইতে মুখ না তুলিয়াই জবাব দেয় বিশ্বজিৎ।

নীলিমা অনুনয়ের সুরে জানাইল, "তুমি ওকে আজ ইস্কুলে দিয়ে এস না।"

এই লইয়া বার চারেক স্বামীকে নীলিমা একই অনুরোধ জানাইল।

"ভজুয়া দিয়ে আসবে'খন। আমার আজ অনেক কাজ।—ও-বাসার মণি, পণ্টু, ধীরু তার সঙ্গে ত যাবে। তাদের সঙ্গে—"

"তোমার যত কথা! পণ্টু-মণিরা আজই যেন প্রথম ইস্কুল যাচ্ছে? আর, তাদের সঙ্গে বুঝি ওর তুলনা?"

"বটে!—তোমার ছেলে কোন্ নবাব নবকেষ্ট এল, শুনি?" বলিয়া বিশ্বজিৎ হাসিতে থাকে।

নীলিমা রাগিয়া ওঠে, "অ্যাঁ! কত কাজ তোমার তা-কি আর জানি না! নরহরিবাবু আজ আসেন নি তাই, নইলে ত এতক্ষণে গান্ধী আর সুবাস বোস নিয়ে পাড়াটা মাথায় করে তুলতে।"

বিশ্বজিৎ হাসে। ছেলের ভর্তি হওয়া সম্পর্কে সব কিছু ব্যবস্থা সে কালই করিয়া রাখিয়াছে। হেড্-মাষ্টার শিবরামবাবুর সঙ্গে তার হৃদ্যতা যথেষ্ট। বাকী আছে শুধু আজ বুক্-লিষ্ট পাইলে বাবলুর বইগুলি কিনিয়া দেওয়া।

তবু স্ত্রী কি-না খোঁচা দিতে ছাড়ে না। কানের দুলজোড়া নাচাইয়া মন্তব্য করিল, নিজের ছেলেকে নাকি এমন হেলাফেলা ভূ-ভারতে কেহ কোনদিন করে নাই।

অভিযোগটা পূরাপূরি স্বীকার করিয়া লইয়া বিশ্বজিৎ আবার কাজে মন দেয়। নীলিমাও কানের কাছে আবার করে ঘ্যান্ ঘ্যান্, "তুমি বুঝি কোনদিন আর ছোট ছিলে না?"

"ওই তোমার কেমন স্বভাব! একটুতেই উতলা হও। ছেলেকে চিরকাল তোমার আঁচলে বেঁধে রাখবে নাকি? এই করেই ছেলে মানুষ করবে, তা হ'লেই হয়েছে!—ছেলেপুলেকে সাহস শেখাতে হয়। এই বয়স থেকে যদি—"

"ঢের হয়েছে, থাম।" নীলিমা বাধা দিয়া কহিল, "সবটাতেই কেবল লেক্‌চার।—প্রথম দিনটায় মন খারাপ অমন সবারই হয়। তুমিও এক লাফে এতটা বড় হয়েছ কি-না!"

যাহাকে লইয়া এত বাদানুবাদ, সেই বাবলু আসিয়া হাজির। পিতা হাসিয়া কহিল, "কিরে খোকা, তুই একা একা স্কুলে যেতে পারবি নে?"

সঙ্গে সঙ্গেই বাব্‌লু ঘাড় নাড়ে সম্মতিসূচক।

"ওরে দস্যি ছেলে!" নীলিমা ছেলের কাছে আগাইয়া গেল দোর-গোড়ায়, "অমন দুঃসাহস করিস্‌ নি কখনো।"

"আমি একাই যেতে পারব মা। সেদিন ও-বাসার কালুদা'র সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে দেখে এসেছি না! থানার কাছেই ত আমাদের ইস্কুল, তারপরই লোন-আপিস্‌, খানিক পরেই ডাকঘর, তারপর মধু কুণ্ডুর গদি, তার পাশ দিয়েই ত আমাদের রাস্তাটা এসেছে। আমি ঠিক চিনে যেতে পারব মা।"

বাব্‌লু গড় গড় করিয়া সারা পথটা মুখস্থ বলিয়া যায়। মায়ের প্রাণ কিন্তু শঙ্কায় কাঁপিয়া ওঠে। কিসের আশঙ্কা তাহা নীলিমাই কি ছাই ভাল করিয়া জানে! মফস্বল শহর। ট্রাম-বাস্‌ নাই। মোটরের উৎপাতও যৎসামান্য। স্বামী তার অল্পদিনেই বেশ পসার-প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছে। তার ছেলে পথ ভুলিয়া গেলেও এই ছো[illegible]হরে হারাইয়া যাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তবু নীলিমার কো[illegible] যেন [illegible]য়! তবু হাসিয়াই কহিল, "বাপ্‌কা ব্যাটা।"

বাবা ছেলেকে আবার উস্কাইয়া দিল, "আজ ভজুয়া নিয়ে যাবে। কাল থেকে কিন্তু তুই একা একা স্কুলে যাবি। ভয় কী!"

নীলিমা ফোঁস করিয়া ওঠে, "তুমি ছেলেকে অমন আস্কারা দিও না ব'লছি।"

"আমি পথ চিনি মা," বাব্‌লু আবার সগর্বে জানায়, "পণ্টুদাও ত একা যায় একা আসে।"

"যার খুশি সে আসুক্‌। তুই যদি অমন কাজ কখনো করিস

খোকা, তাহ'লে বাড়ি এলে কিন্তু টের পাবি।" মা শাসনের ভয় দেখায়!

ছেলে আপাতত চুপ করিল। সঙ্কল্পটা মনে মনেই রাখে। স্কুলের রাস্তা কোন্ ছার, দু'চারদিনের মধ্যেই মাকে সে প্রমাণ দিয়া ছাড়িবে, এক ক্রোশ দূরে সেই রহমৎপুরের মাঠে—ডিষ্টিক্ট বোর্ডের রাস্তার কাছে গত চৈত্র সংক্রান্তিতে যে মস্ত বড় মেলা বসিয়াছিল, সেখানটায়—বাব্লুও একা গিয়া একাই ফিরিয়া আসিতে পারে।

বিশ্বজিৎ তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া লইয়া খাইতে বসিয়াছে। নাছোড়বান্দা গৃহিণীরই জয় হইয়াছে।

এদিকে নীলিমা ছেলেকে সাজাইতে ব্যস্ত। গেল পূজার জরীর আঁচ-দেওয়া কাপড়খানি পরিয়া, সিল্কের পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়া, মুখে খানিক পাউডার মাখিয়া খোকা এখন বাব্লুও নয়, সুরজিৎ, —বোধ হয় নীলিমারই বিমুগ্ধ মনের সকৌতুক মন্তব্য অনুসারে, বিয়ের বর আর কি!

বাব্লু এতক্ষণ কোন আপত্তি করে নাই। কিন্তু চোখে কাজল সে কিছুতেই পরিবে না। সে যেন এখনো ছোট-ই আছে!

মা ছেলের সহাস্য হাতাহাতির মাঝখানে বিশ্বজিৎ মুখ ধুইয়া ঘরে ঢুকিল।

"এ্যা! এ যে একেবারে রাজপুত্তুর! ছেলে তোমার দিগ্বিজয়ে বার হচ্ছে বুঝি?"

বাব্‌লু লজ্জায় মুখ লুকাইল মায়ের বুকে। নীলিমাও হাসি চাপিয়া কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিল, "তোমায় কোন কাজের কথা ব'ল্‌লে তখন ঠ্যাং খোঁড়া হয়, আর অ-কাজের বেলায় পঞ্চমুখ," বলিয়া বাব্‌লুর সলজ্জ মুখখানি জোর করিয়া তুলিয়া ধরিল, "লজ্জা কিসের, মুখ তোল। বোকা কোথাকার! তুই যেন ওর মত গেঁয়ো পাঠশালায় পড়্‌তে যাচ্ছিস্‌। সেদিন বুঝি আর আছে? মুখ তোল্‌"

বিশ্বজিৎ প্রস্তুত হইয়া লইল। স্কুল হইয়া কোর্টে যাইবে।

"আর একটা অনুরোধ আমার রাখবে আজ?

"কী?"

"আগে কথা দাও।"

"বল না কী করতে হবে?"

"তোমার কোর্টে যাবার পথেই ত পোষ্ট আপিস। মার টাকাটা আজ তুমিই পাঠিয়ে দাও। কাল পাঠান হয় নি।"

নীলিমার হঠাৎ এমনধারা অনুনয়ে বিশ্বজিৎ একটু বুঝি বিস্মিত হয়। নীলিমাই ত নিজের হাতে কুপন লিখিয়া ভজুয়াকে দিয়া তার শাশুড়ীর নিকট টাকা পাঠাইয়া দেয় প্রতি মাসে।

বিশ্বজিৎ জবাব দিল, "আমার সময় হবে না। ভজুয়াই পাঠিয়ে দেবে!"

"ভজুয়া না আজ খোকার টিফিনের সময় খাবার নিয়ে যাবে।"

'সে ত দেড়টার সময়। তিনটে অবধি মনি-অর্ডার নেয়।"

"তোমায় দিয়ে যদি কোন উপকার হয়। ছেলে বটে!" বলিয়া নীলিমা রাগ দেখাইয়া বাহির হইয়া যায়।

মঙ্গলঘটের কাছে কপাল ঠেকাইয়া, দূর্বা বেলপাতা মাথায় লইয়া, জননীকে প্রণাম করিয়া বাব্‌লু তার বাবার সঙ্গে বার-দুয়ারটা পার হইয়া রাস্তায় পড়িয়াছে অনেকক্ষণ। নীলিমা তবু একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। খোকা আর সে খোকা নাই! দস্তুরমত শ্রীমান্ সুরজিৎ রায়।

ফিরিয়া আসিয়া নীলিমা এই অসময়ে বিছানায় শুইয়া পড়িল: চাকরটার ভাত ত বাড়াই রহিয়াছে।.........

খোকা সত্যই তবে বড় হইয়াছে। স্কুলে যাইতেছে আর সব ছেলের মতই। পুত্রকে দিয়া নীলিমার ভবিষ্যৎখানি কত সুখের স্বপ্নে বোনা। তবু এই ছন্দোময় বর্তমানের বুকে কোথায় যেন, কেন যেন, বেশ একটু বেসুরা বাজে আজ।

বিছানার উপর উঠিয়া বসিল নীলিমা। রাস্তা দিয়া লোক চলিয়াছে আপন আপন কাজে। স্বামী কাজে বাহির হইয়াছে। খোকারও এতদিনে স্বতন্ত্র কাজ সুরু হইল। তার নিজেরও গৃহস্থালির শেষ কোথায়?

নীলিমা আজ বুঝিতে পারে অনেক কিছুই। অন্তত আজ হইতে বুঝিল ত বটেই। মনের দুয়ারে যত সব অশিষ্ট প্রশ্নের আঘাত সুরু হইয়াছে। একে একে মনে পড়ে সব খুঁটিনাটি। এই ত সবে আট বছরের কথা! ইহারই মধ্যে কোথাকার জল কোথায় যে গড়াইল!

ভজুয়া আসিয়া ডাকিল, "মা, নাইতে যান!—বারোটা বেজে গেছে।"

"যাক্"—নীলিমা পাশ ফিরিয়া শোয়। কি একটা অস্পষ্ট কথা যেন

আজ স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে চায়। আর, সেই কথাটা পরিষ্কার করিতে গেলেই সহসা টান পড়ে তার গোটা বিবাহিত জীবনের উপর.........

শাশুড়ী তাকে কোন দিনই সুনজরে দেখিলেন না। এ কি কম দুঃখের কথা! ছেলে তাঁর গ্রামের হাই স্কুলে মাষ্টারি লইয়া মায়ের কাছে জীবন কাটাইতে রাজী হইল না এত অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও, সে-ও কি নীলিমার অপরাধ?........

বিশ্বজিৎ-এর সেই উচ্চ আশার চারাগাছ মহীরুহ হইতে পারে নাই। কলিকাতায় সুবিধা হইল না। গেল মফস্বলে। আজ ছয় বৎসর এখানে আসিয়া পসার তার মন্দ জমে নাই। নীলিমা ত ইহাতেই সুখী। স্বামীর মনের দৃষ্টি কিন্তু এখনো পড়িয়া আছে কলিকাতা হাইকোর্টে। আশা ছাড়ে নাই। আরও কিছু টাকা জমিলেই একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবে।

মায়ের শুশ্রূষার জন্য ছেলে তার বৌকে দেশের বাড়ীতে কেন রাখে না, সে-কথার জবাবও নীলিমা দিবে নাকি? শাশুড়ীর মত তাঁর শ্বশুরের ভিটা আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিবার মত অন্ধ আসক্তি না থাকিলেও, সে কোনদিন স্বামীর সঙ্গে বিদেশে যাইবার বায়না ধরিয়াছিল কি? অথচ শাশুড়ী আজ সাত বছর ধরিয়া যখন তখন আত্মীয় স্বজনদের কাছে সকল কাজের কলকাঠি বলিয়া দোষারোপ করিয়া আসিতেছেন পরের মেয়েকে। ওদিকে তাঁর নিজের তিনটি মেয়েই না যার যার স্বামীর কর্ম্মস্থানে ঘরসংসার করিতেছে নির্বিবাদে। শাশুড়ীও নিশ্চিন্ত। মেয়েদের সৌভাগ্যে একটু গর্ব্বিতও বটে। একেই বলে ধর্ম্ম।

কিন্তু নীলিমার অধর্মের ভয় আছে। যে না ছেলে তার শাশুড়ীর!

চিঠিপত্র দিয়া মায়ের খোঁজ-খবর লইবার ভারটাও স্ত্রীর উপর ফেলিয়া দিয়া খালাস। নীলিমাকে তাই প্রতি চিঠিতেই লিখিতে হয়—উনি সব সময় কাজে ব্যস্ত। ভালই আছেন। পৃথক পত্র দিলেন না। ইত্যাকার।

বাড়ীর চিঠি আসিলে স্বামী অবশ্য জিজ্ঞাসা না করেন এমন নয়—মা কি লিখেছেন গো? ভাল আছেন? ছোড়দিকে কাছে এনেছেন? লিনার আবার সন্তান-সম্ভাবনা? মাকে তবে দশ টাকা বেশী পাঠাবে এবার। ইত্যাদি।

শাশুড়ীও চিঠি দেন—বিশু কেমন আছে? কখনো বা, খোকার কোর্ট বন্ধ হইবে কবে? আমার দাদু কেমন আছে? তাকে কিন্তু মারধর করিও না, আমার মাথার দিব্বি বৌমা! এবম্প্রকার।

ছেলে বটে! মার কাছে নিজের হাতে দু'ছত্র লিখিলে যেন মহাভারত অশুদ্ধ হয়! আজ ত এত করিয়া অনুরোধ করিল নীলিমা, তবু মার কাছে মানি-অর্ডারটা করাইতে পারিল?

শাশুড়ীর উপর আজ সত্যই নীলিমার বড় মায়া হয়। সারা বছরের মধ্যে পূজার সময় দিন কয়েকের দর্শন পাইয়া মায়ের প্রাণ কত ভাবে কত দিকে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে নীলিমা স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াছে। ছেলে কি কখনো পর হয় কোনদিন!—যতই কেন না দোষারোপ করুন, পুত্রকে তাঁর পুত্রবধূ গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে। নীলিমা অমন মেয়েই নয়। নহিলে, শাশুড়ীর অদৃষ্টে অনেক কিছুই লেখা ছিল। কি হইত? কি যে হইতে পারিত তাহা হইলে, সেই কথাটার মুখ চাপা দিয়া নীলিমা সহসা উঠিয়া দাঁড়ায়। একটার সময় ভজুয়া বাবলুর খাবার লইয়া যাইবে আর

ফরিবার পথে ডাকঘর হইয়া শাশুড়ীর এ-মাসের টাকাটাও পাঠাইয়া আসিবে।

"হ্যাঁরে ভজুয়া।" গৃহকর্ত্রীর ডাকে ভজুয়া আসিয়া কাছে দাঁড়ায়।

"দেশে চিঠি দিস্ তুই ?"

ভজুয়া মাথা নাড়ে।

"তোর মাও লেখে না ?"

"না।"

"কেন ?—আমায় বললে, তোর চিঠি বুঝি আমি লিখে দিতে পারি না ?—হতভাগা !"

বেলা তিনটা বাজিয়া যায়। তবু ভজুয়ার দেখা নাই। হতভাগা কোন্ আড্ডায় ভিড়িয়া গিয়াছে।............

নীলিমা এদিকে উদ্গ্রীব হইয়া আছে। খোকার একটা খবর চাই। নিশ্চয়ই তার মন আজ কেমন-কেমন করিতেছে। মাকে ছাড়িয়া এতক্ষণ কোনদিন কোনখানেই কাটায় নাই সে। হয়ত অপরিচিত সহপাঠীদের মধ্যে প্রথম দিনটায় সে জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে, একটি কোণে মার কথা, বাড়ীর কথা, বার বার মনে পড়িতেছে নিঃসন্দেহে।

স্কুলে আর তেমন মারধর করে না। নীলিমা শুনিয়াছে, বেত-মারা বে-আইনী আজকাল। মাঝে মাঝে একটু-আধটু চোখ-রাঙান, বড় জোর মৃদু কানমলা বা চড়-চাপড়—ইহার বেশী আর কিছু নয়।

তা-ও আজ প্রথম দিনেই বাব্লুকে কিছু বলিবে না তারা। তবু নীলিমার ভয় করে—কেমন যেন অস্পষ্ট অসহ্য আতঙ্ক।

বার-দুয়ারে শব্দ পাইয়া নীলিমা ডাকিয়া কহিল, "ভজুয়া এসেছিস?"

"হ্যাঁ মা।"

"এত দেরি হ'ল যে?"

দেরী হইবার সঙ্গত কারণের অভাবে ভজুয়া চুপ করিয়া রহিল।

"খোকাকে তুই নিজের হাতে খাইয়ে এসেছিস্ ত?"

"হুঁ"

"দুধ সব খেলে? ফেলে দেয় নি ত?"

"না।"

খানিক নীরব থাকিয়া নীলিমা আবার প্রশ্ন করে, "খোকা কিছু বল্‌লে?"

"না।"

"কিছু না?"

প্রশ্নটা ভাল বুঝিতে না পারিয়া ভজুয়া গৃহকর্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"বাড়ি আসতে চাইলে না?"

"না মা।"

"তোকে আমার কথা কিছু জিজ্ঞেস করলে না?"

"উহুঁ।"

নীলিমা আর উচ্চবাচ্য না করিয়া ঘরে ফিরিয়া যায়। বাড়ীর জন্য

বাব্লুর মন এখন ছট্‌ফট্ করিতেছে নিশ্চয়ই। ভজুয়াটা আস্ত গর্দভ। তলাইয়া বুঝিতে জানে না কোন কিছুই।

খানিক বাদে আবার ডাকে নীলিমা, "ভজুয়া!"

"যাই মা।"

ভজুয়া হাজির।

"মার টাকা পাঠিয়েছিস্?"

"হ্যাঁ"—ভজুয়া রসিদ বুঝাইয়া দিয়া ফিরিয়া চলিল।

"ভজুয়া!"

ভজুয়া ফিরিয়া দাঁড়ায়!

"খোকাকে তুই কোথায় দেখ্লি? ক্লাসের মধ্যে, না বাইরে?"

"বাইরে।"

"কি করছিল তখন?"

"খেলছিল।"

"খেলা করছিল?"

"হ্যাঁ মা। ইস্কুলের সামনে যে ছোট মাঠ আছে সেখানে ছেলেদের সঙ্গে বুড়ি-ছোঁওয়া খেলছিল।"

"আচ্ছা! তুই যা এবার।"

ভজুয়া চলিয়া গেল। নীলিমা যেমন ছিল তেমনি বসিয়া আছে। তবে খোকা একটিবারও মার কথা জিজ্ঞাসা করে নাই! বিচিত্র কি! বাঘের বাচ্চা আজ রক্তের স্বাদ পাইয়াছে!

সঙ্কীর্ণ গৃহের বর্ণ-পরিচয় সাঙ্গ করিয়া আজ যে বাব্লু বৃহত্তর বাহিরে অবাধ বিচরণের প্রথম পাঠ গ্রহণ করিত গিয়াছে। খোকা সত্যই ডাগর

হইয়াছে! বাড়িতেছে ক্ষণে ক্ষণে, অবাধে, দিনে দিনে, অবলীলাক্রমে—নীলিমার জাগ্রত মনের উপর দিয়া জানিতে ও অজানিতে। বাড়িয়া চলিয়াছে সব কিছুই। চতুর্দিকে শুধু নিরবচ্ছিন্ন হওয়া আর হইয়া ওঠা।'

ঘণ্টা দেড়েক বাদে নীলিমা আবার জানালার কাছে গিয়া বসিল সাড়ে চারটা বাজিয়া যায়। ভজুয়া বাব্‌লুকে আনিতে গিয়াছে। আধ ঘণ্টার উপর হইবে। তবু দেখা নাই।

নীলিমা চাহিয়া আছে। চৌধুরী সাহেবের বৈঠকখানার সম্মুখের ঐ ছোট্ট ফুলের বাগানটার কোল ঘেঁষিয়া রাস্তাটা যেখানে নীলিমাদের শোবার ঘরের জানালাটার দৃষ্টিপথের মধ্যে হঠাৎ একটা পাক খাইয়া অদৃশ্য হইয়াছে সেখানটায় কখন্ খোকার মুখ্‌খানি মার নজরে পড়িবে।······

শাশুড়ীর মত তারও আজ হইতে পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিবার পালা সুরু হইল। তফাৎ শুধু: একজন করে মাস গণনা, আর একজন ঘণ্টার হিসাব রাখে। নীলিমা যেন আজই পুরাপুরি মা হইল—সাত বছর আগে নয়।······

আরও আধ ঘণ্টার মত দেরী করিয়া রাস্তার বাঁকে ভজুয়ার সঙ্গে নীলিমার খোকা এতক্ষণে দেখা দিল। নীলিমা ছুটিয়া গেল বার-দুয়ারে। কিন্তু খানিকক্ষণ কেমন যেন থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। খোকার ত শুক্‌নো মুখ-চোখ নয়! সে যে হাসিতেছে। নীলিমার এতক্ষণের উন্মন প্রতীক্ষা বাব্‌লুর খুশীর গায় যেন ধাক্কা খাইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল দারুণ হতাশায়।

"দাঁড়াও, আগে আমার বই-শেলেট সব রেখে আসি," বলিয়া জননীর প্রসারিত বাহুব আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া বাব্‌লু পড়ার ঘরে ঢুকিল।

"হ্যাঁরে ভজুয়া, তোদের আসতে এত দেরি হল কেন?"

"আর বলো না মা! খোকাবাবু বুঝি কথা শোনে আমার!—খানিকটা পথ এসেই আবার দাঁড়িয়ে পড়ে। ডাকবাংলায় এক সাহেব এসেছে, তাকে না দেখে আসবে না। ডাকঘরে গিয়ে টেলি-করা আজই দেখা চাই।"

"তুই বাধা দিস্‌নি কেন?"

"আমায় ধমকে ওঠে যে," বলিয়া ভজুয়া হাসিয়া ওঠে, "জলের কলের কাছে এসে আর উঠতেই চায় না। কাল দেখাব বললাম, কানে কথাই তোলে না! কি সাহস খোকাবাবুর মা! দুগ্‌গা বাড়ির পুলের ওপর উঠে রেলিং ধরে ঝুলতে চায়।"

নীলিমা রুখিয়া ওঠে, "তোকে দিয়ে কোন কাজ হবে না বাপু রাস্তা ছ্যাখ। একটা ছোট ছেলেকে বাগ মানাতে পারিস না!—বসিয়ে বসিয়ে কে কোথায় খাওয়াবে যা না সেখানে।"

ভজুয়া ত অবাক! ভাবিয়াছিল, খোকাবাবুর বীরত্বের ফিরিস্তি পাইয়া গৃহকর্ত্রী বুঝি খুশীই হইবেন। ফল যে হইল উল্টা। ভজুয়া আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরিয়া পড়ে।

নীলিমা বার কয়েক ডাকাডাকির পর বাব্‌লু এতক্ষণে মার কাছে আসিল।

"চট করে খেয়ে নে।"

"আমার এখন খিদে পায়নি মা।"

দৃঢ়কণ্ঠে মা কহিল, "পেয়েছে। দুধের সরটা আগে খেয়ে ফ্যাল।—তোর কখন খিদে পায়, না-পায়, তা বুঝি তোর কাছ থেকে আমি শিখতে যাব ?"

বাব্‌লু গায়ের জামাটা ছাড়িয়া দুধের বাটিটা টানিয়া নিল। মনে তার আজ সহস্র জিজ্ঞাসা। এতদিন মাঝে মাঝে ভজুয়ার সঙ্গে অল্প সময়ের ফাঁকে যে-বহির্জগতের মৃদুমন্দ আভাস পাইয়া আসিয়াছে, আজ তার অবারিত আস্বাদের ছাড়পত্র মিলিয়াছে চিরদিনের জন্য।

নীলিমা বিমুগ্ধ দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া আছে সন্তানের মুখখানির দিকে।

"পড়া জিগ্‌গেস্‌ করেছিল ?"

"প্রথম দিন বুঝি পড়া দিতে হয় !—তুমি কিচ্ছু জান না মা।"

নীলিমা নিষ্পলক চোখে খানিক চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "আমি না হয় জানিই না, তাই বলে অমন করে বুঝি মায়ের কথার জবাব দিতে হয় ?"

খোকা খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। নীলিমা তাকে কোলে টানিয়া বিছানার এক কোণে বসিয়া পড়িল।

"খোকা ! আজ বাড়ির জন্যে তোর মন কেমন করছিল, না রে ?"

"না ত।"

"নিশ্চয় করেছে। ভজুয়ার সঙ্গে তখন বাসায় আসবার জন্য মনে মনে ছটফট করেছিস, কেমন ?"

পুত্রের নিকট হইতে এবার কোন জবাবের অপেক্ষা না রাখিয়াই ধরা গলায় নীলিমা বলিয়া চলিল, "ভয় কি রে বোকা ! চিরকাল তোকে আমি আগলে থাকব নাকি ? এখন না তুই বড় হয়েছিস্‌ !"

জননীর কণ্ঠস্বরের এই আকস্মিক পরিবর্তনটা বুঝিতে না পারিয়া বাব্‌লু জিজ্ঞাসু চোখে চাহিয়া রহিল।

"খোকন!"

"কী মা?"

নীলিমা ছেলেকে একবার বুকে জড়াইয়া ধরিল। সে বেশ জানে, নদী কখনো সরোবর হয় না। না-ই বা হইল। তবু আজ সর্ব্বাঙ্গ দিয়া, এই উদ্বেল মুহূর্ত্তে, নীলিমা যেন মায়ের উপর একান্ত নির্ভরশীলতার নাগালের মধ্যে ভবিষ্যতের এক বলিষ্ঠ যুবককে একটিবার বাঁধিয়া ধরিয়া রাখিবার স্বপ্ন দেখিয়া লইল।............

"খোকা, এখন থেকে ত রাতদিন তুই বই নিয়েই কাটাবি। কত বন্ধু হবে তোর।"

বাব্‌লু জননীর বুকে চুপ করিয়া আছে।

"হ্যাঁরে দুষ্টু ছেলে! কথা বলিস্ না যে?—বাড়িতে দুবেলা শুধু বই নিয়েই থাক্‌বি ত?"

"না মা," জবাব একটি না দিলে নয় তাই কথা বলে বাব্‌লু।

"নিশ্চয় তুই বই নিয়ে পড়ে থাকবি, তারপরে থাকবি বৌ নিয়ে।"

"যাঃ!"

"অ্যাঁ! বড় যে ভালমানুষি দেখান হচ্ছে! তোর পেটের কথা আমি যেন আর টের পাইনি কি না!"

খোকা অকারণ লজ্জায় মৃদু মৃদু হাসে। নীলিমা আবার ধরা

গলায় বলিয়া গেল, "খোকন! তুই আর যা-ই করিস্, কি হপ্তায় আমায় কিন্তু একখানা করে চিঠি দিস্—নিজের হাতে লিখ্‌বি। ভুলিস্ নি যেন। বৌ-এর উপর ভার দিয়ে দায় সারলে চলবে না কিন্তু। বুঝ্‌লি?"

কালীয়দমন

অতসী যুবতী। অতসী বিধবা। গ্রামের একমাত্র জমিদার ত্রিলোক চক্কোত্তির বড় আদরের মা-মরা ছোট মেয়ে অতসী। সেই অতসী কি-না কাঁদে। কাঁদিতেছে! বুকফাটা ক্রন্দন! তাই বলিয়া অতসী কিন্তু প্রেমে পড়ে নাই, কাউকে সে ভাল বাসে নাই। তাকে দু'কথা শোনাইয়া মনে ব্যথা দিতে পারে এত বড় দুঃসাহস এ-গাঁ-এ কাহারো নাই। তবু অতসী কাঁদিতেছে। প্রেমে পড়িয়া নয়—প্রেমের গায়ে আঘাত খাইয়া।

তাহাকে নাকি ভালবাসিয়াছে তারই পিতার এতদিনের অতি-বিশ্বাসী কর্ম্মচারী যতীন ঘোষাল! তাই সে কাঁদে। কাঁদিয়াই অতসী সেই অপমানের প্রতিশোধ লইতে চায়। মণি-হারা ফণিনীর মত ফুঁসিয়া রুষিয়া যে-প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়াছে কাল রাত্রে, আজ ভোরের আলোয় চোখের জলে তাহারই শেষকৃত্য করিতে চায়।... এত বড় আস্পর্দ্ধা! তাহার বৈধব্যের সুযোগ লইয়া মনে করিয়াছে সে এতই সস্তা, এতই অসহায়!

যতীন ঘোষালকে এখন সে হাতের কাছে পাইলে বুঝি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে। কিন্তু অপরাধী এখন আয়ত্তের বাহিরে,—দেড়-শ' মাইল দূরে; কলিকাতায়। কাল রাত্রের গাড়ীতেই সে চক্রোতি গোষ্ঠীর ম্যানেজারের পদে ইস্তফা দিয়া চিরকালের মত পলাশপুর ছাড়িয়া চলিয়া গেছে। ভুল বুঝিয়াছিল, ভুল ভাঙ্গিতেই পলাইয়া বাঁচিয়াছে—লজ্জায়, নিরাশায়, অপমানে, বা অভিমানে,—কে জানে। রাতারাতি একেবারে দেড়-শ' মাইল ব্যবধান!

ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে অতসী,—ফুলিয়া ফুলিয়া। রুদ্ধ দুয়ার। বিস্রস্ত এলোচুল। বিক্ষুব্ধ চেতনা। কাল রাত্রের সেই ক্রুদ্ধ সিংহিনী আর নাই। বহ্নিশিখা জ্বলিয়া পুড়িয়া আজ এখন মুঠা মুঠা ছাই। এই ভস্ম-রাশির মধ্যে কোন ছলে কোন অদৃশ্য বীজ যদি লুকাইয়াই থাকে, তাহা এখন চোখের জলের অবাধ স্রোতে একেবারেই ধুইয়া মুছিয়া যাইবে: এ তার ক্রন্দন নয়—প্রায়শ্চিত্ত। যে-পাপকথা দুটি পোড়া কাণে শুনিয়াছে, অশ্রুজলে তাহারই প্রবাহ-প্রক্ষালন!

অতসী সে জাতের বিধবা নয়। বুদ্ধিমতী সে। বৈধব্য তার দুঃসহ আত্মনিপীড়ন নয়,—স্বচ্ছন্দ তপশ্চরণ; আয়সী যুদ্ধসাজ নয়,—অনায়াস সাত্ত্বিকতা! শাস্ত্রজ্ঞ পিতার অতসী সুযোগ্যা কন্যা। বাবার মুখে পুঁথির মধ্যে পুরোহিতের কাছে যাহা কিছু শুনিয়াছে, যাহা কিছু বুঝিয়াছে, প্রাত্যহিক জীবনের প্রতি পদে কাজেও তাহা পালন করিয়া সে ঘরে-পরে সকলকে তাক্ লাগাইয়া দিয়াছে। এমন যে পরম নৈষ্ঠিক-তাহাদের কুল-গুরু বৈষ্ণবাচার্য্য নিত্যানন্দ প্রভুজী, তিনি পর্য্যন্ত মুখর হইয়া সশ্রদ্ধ প্রশংসা জানাইয়াছেন বারবার। যেমন বাপ, তেমনি তো মেয়ে!

অতসী দীক্ষা নিয়াছে। গলায় পরিয়াছে কণ্ঠী কপালে কাটে তিলক। বাহুতে দাগে গঙ্গামাটির ছাপ। গরদ পরিয়া আহ্নিকে বসে। নাম-জপে আত্মহারা হয়। কৃষ্ণকীর্ত্তনে কেমন হইয়া যায়। শুইতে বসিতে নাহিতে খাইতে সবসময়ই শুধু সেই 'অখিল রসামৃতে'র আস্বাদ-ভিখারী। দ্বিপ্রহরের অবসরকেও শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার শ্লোকে শোকে ভরিয়া রাখে। সকাল-সন্ধ্যা আরাধ্য গোপালের প্রস্তর পুতুলকে ক্ষণে ক্ষণে শোয়াইয়া, বসাইয়া, কোলে লইয়া, বুকে থুইয়া, আপন মনের নানান্‌রঙে রাঙাইয়া দেখে।

শুধু কি তাই! তেইশ বছরের অতসী নাকি ইহারই মধ্যে বৈষ্ণব দর্শনের মূলসুরকে অন্তরের তারে তারে মিলাইয়া লইয়াছে। এমন কি, পিতার নিকট হইতে সে 'অচিন্ত্য ভেদাভেদের' সুচিন্তিত ব্যাখ্যা সম্যক বুঝিয়া শিখিয়া রাখিয়াছে। প্রতি-বছর রাসলীলা উৎসবে তাহাদেরই নাটমন্দিরে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে সে মহাপ্রভুর "গম্ভীরালীলা" কীর্ত্তন করিয়া ভক্তি-বিহ্বল করিয়া দেয়।

পিতা-পুত্রী এক সঙ্গে তীর্থ-ভ্রমণ সারিয়া রাখিয়াছে। বৃন্দাবনে নন্দপুর-চন্দ্রের কেলীকুঞ্জ দেখিয়া আসিয়াছে। নবদ্বীপের পথে পথে তাহার যেন পায়ের চিহ্ন খুঁজিয়াছে। পুরীধামে জগন্নাথের মন্দিরের চাতালে ভাবনেত্রে কোন্ বিশ্ব-পাগলের অচৈতন্য সোনার পুতুলি দেখিয়া কাঁদিয়াছে। কাশী, গয়া, প্রয়াগ, মথুরা,—সর্ব্বত্র পিতা কন্যাকে আর কন্যা পিতাকে দান-প্রতিদানে মনেপ্রাণে পূর্ণ করিয়া আনিয়াছে।

অমন বংশের তেমনি মেয়ে অতসীর অপমান তাই আজ একান্তই মর্ম্মভেদী! সে কাঁদিবে না ত কাঁদিবে কে?

রুক্ষুশুষ্ক একপিঠ এলোচুলে অতসী এতক্ষণে চোখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। দেয়ালে-টাঙানো আছে মৃত স্বামীর বাঁধান ছবি। নিষ্পলক চোখে খানিকক্ষণ সেদিকে চাহিয়া চোখ বুজিল। চোখ বুজিয়া একবার হাতড়াইয়া দেখিল স্মৃতির চোর-কুঠরি: ছায়া-ছায়া ভাসা-ভাসা এক শারীর অস্পষ্টতা ধয়া-ছোঁয়ার আড়ালে পড়িয়া আছে! চারিচোখের মিলনের পরে সাত মাসের সেই ছোট অধ্যায়টির উপর দশ বছরের একটানা এক পান্‌সে প্রাত্যহিকতা স্থির হইয়া আছে একখানি ঘন কুহেলিগুণ্ঠনের মত!

আবার চোখ মেলিয়া চাহিল অতসী। কোন ছলে কোন উপায়ে ছবিতে-মনেতে একটা সুসঙ্গত মিল বাহির করা যায় কিনা। আবার চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া আছে। খানিক বাদে ছবির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া সহসা কাঁদিয়া উঠিল—

ওগো তুমি স্পষ্ট হয়ে ওঠ,—স্পষ্ট হয়ে ওঠ। ছবি নও,—প্রমাণ করো, তুমি শুধু ছবিই নও। অমন করে আড়ালে পড়ে থেকো না গো! কথা কও। আমার নীরব ব্যথায় মুখর হয়ে ওঠ। তুমি নেই বলেই না লোকে আমায় এমন করে অপমান করতে সাহস পায়!

স্বামীর ছবির কাছ হইতে ফিরিয়া গেল অতসী আবার ঐ দক্ষিণের জানালার ধারে। কোন সাড়া পাইল কি-না কে জানে। চাহিয়া আছে দুটি চোখ যতদূর পারে মেলিয়া দিয়া। কি যেন দেখিতে চাহিল, কি যেন জানিতে চাহিল, বুঝি একবার নূতন করিয়া বাঁচাইয়া বাজাইয়া দেখিতে চায় দশ বছর আগেকার ফেলিয়া-আসা সেই অতীতকে।

খানিক বাদে উঠিয়া গেল ঠাকুর ঘরে। আরাধ্য গোপালকে বুকে তুলিয়া নিল। মৃত ছেলেকে কোলে লইয়া উন্মাদিনী মায়েরই মত বুকের মাঝখানে বিগ্রহকে শক্ত করিয়া জড়াইয়া ধরিল; কাঁদিয়া কহিল—ওগো গোপিকারমণ, বিশ্বে যদি আর কেউ নেই, তুমি তো আছ। তুমি কথা কও। ওগো আমার জন্মজন্মান্তরের পরাণ বঁধুয়া! তুমি আজ সব খানি জুড়ে বস, আমায় তুমি নিঃশেষে ঢেকে ফেল তোমার সব-ভোলানো সব-জানানো বিষামৃত প্রেমের ধারায়। আমি যে আজ একান্ত অসহায়।

অনেকক্ষণ স্তব্ধ অতসী গোপালকে বুকে আঁকড়াইয়া রহিল। অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া ঠাকুর ঘরের দুয়ার খুলিয়া অতসী যখন বাহিরে আসিল বেলা তখন আড়াইটা!

বাড়ীর কেহই আশ্চর্য্য হইল না। এমনধারা বাড়াবাড়ি দেখিতে তাহারা অভ্যস্ত। তাহাদের চোখে অতসীর সব-কিছুই এখন মুখস্থ-করা কবিতার মত সুনির্দ্দিষ্ট। কৃচ্ছ্রসাধনের প্রারম্ভের সেই নূতনত্ব অনেককাল আগেই নিতান্ত ফিকা হইয়া গেছে।

শুধু কাঁদিল অতসী। সেদিন সারা বিকালটা ঘরের-দুয়ার ভেজাইয়া দেয়ালে টাঙানো শ্রীকৃষ্ণের কালীয়দমন মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া চাহিয়া কেবলি কাঁদিল।

রাত্রে শুইবার আগে বিছানায় বসিয়া অতসী আবার কি আশায় স্বামীর ছবিখানি শিয়রের কাছে রাখিল। চোখ বুজিয়া আরাধ্য গোপালের কাছে নীরব প্রার্থনা জানাইল—গোপাল, তুমি সাড়া দাও। তুমি তো আমায় ভুলে থাকতে পার না। তোমার মতন-অমন করে আর একজনকে—ঐ ছবিকেও সাড়া দিতে শিখিয়ে দাও। তোমায় পেলে

সবাইকেই পাওয়া হ'ল এতো আমি বুঝি, তবু, তবু আমার স্বামীকে একবার উজ্জ্বল করে তুলে জানিয়ে দাও তুমিই সত্য, তোমাতেই-সব,—ইহকাল, পরকাল, জন্মজন্মান্তর। তুমি ত সব পার। যতীন ঘোষালের চোখের ঠুলি যে তুমিই খুলে ফেলতে পার। ভুল করেছে সে। ভুল সে বুঝেছে। তাই, না রাতারাতি পালিয়ে গেছে। সে ত অতি হীন অতি নীচ নয়। যে অনুতাপের ছায়াখানি তার মুখে দেখেছি সে ত মিথ্যা নয়। তাকে তুমি সুমতি দাও, বল দাও। যে-প্রেম সে আমায় জানিয়েছে সে প্রেম তুমি তোমার করে নাও। তাকে তোমার কাছে টেনে নাও। সে খোঁড়া নয়, শুধু একবার হোঁচট খেয়েছে। তাকে তুলে নাও, তাকে তুলে নাও।

বাতিটা চড়াইয়া দিয়া অতসী আর একবার পড়িল যতীন ঘোষালের বিদায় চিঠি। প্রতিটি অক্ষর অনুতাপের চোখের জলে ধোয়া, অণুতম অশিষ্টতা কোথাও যদি থাকে! হায়! অতসী যে তাহাকে ক্ষমা করিয়াছে এ-কথা জানাইবার উপায় নাই। তাহার ঠিকানা জানিলে, অতসী এখনই লিখিয়া পাঠাইত,—ভালবাস, ভালবাস শুধু তাকেই, যার ভালবাসায় আমি অন্ধ, যাকে ভালবেসে আমি শুদ্ধ,—তেমোর ভালবাসাকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে খাঁটি সোনা করে তাকেই শুধু দাও। অতসী-ময় তিনি। ভালবাস, তোমার সর্ব্বস্ব দিয়ে ভালবাস, সেই সর্ব্বগ্রাসী অতসীকে।......

মাঝ রাতে কখন অতসী স্বামীর ছবি বুকে রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

শেষ রাত্রে অতসী স্বপ্ন দেখিতেছে। কালীয়দমন নামিয়া আসিয়াছে ছবির পট ছাড়িয়া। তার শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইল সেই ননীচোর

নন্দদুলাল। ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি! সেই মৃদু মৃদু হাস, সেই লহু লহু ভাষ! ঐ যে চাঁচর কেশে চিকন চূড়া!—ঐ না সেই পুচ্ছ! ঐ তো তার ভুবনমোহন রসঘন মূর্ত্তি! অতসী হাত বাড়াইয়া স্পর্শ করিতে গেল। কালীয়দমনকে ছুঁইতে না ছুঁইতেই তার হাতের মুঠিতে ধরা পড়িল যাঁর বসনাঞ্চল সে তো কালীয়দমন নয়। ফ্রেমে-আঁটা স্বামীরই কেমন এক সক্রিয় আবির্ভাব।

কাঁদিল অতসী। শক্ত করিয়া সেই ছায়ামূর্ত্তির কোঁচার খুঁট ধরিয়া কহিল, "ওগো তুমি এসেছ, আমি এত করে ডেকে সারা হলাম, তুমি এতক্ষণে সাড়া দিয়েছ!"

ছায়া মূর্ত্তি আগাইয়া গেল। অতসীর রুক্ষুশুষ্ক চুলে হাত বুলাইল! সোহাগ করিয়া সন্নিধ্যে টানিয়া নিল। গায়ের পাঞ্জাবি দিয়া,—হ্যাঁ ঠিক ছবির ঐ ডোরা-কাটা পাঞ্জাবিরই প্রান্ত দিয়া,—অতসীর চোখের জল মুছাইয়া দিল। আদর করিয়া অতসীর মাথাটাকে আলগোচে রাখিল তাহার কাঁধে। খানিকক্ষণ—অনেকক্ষণ। তারপর......তারপর আবেশ-বিহ্বল অতসী চোখ মেলিয়া চাহিতেই চীৎকার করিয়া উঠিল। স্বামী নয়! স্বামী নয়!—একি!—এ যে যতীন ঘোষাল! যতীন ঘোষাল !!

চীৎকার শুনিয়া পাশের ঘর হইতে অতসীর পিসিমা ছুটিয়া আসিয়াছেন। ছুটিয়া আসিয়াছে বড় বোন বাতাসীও।

আহত পাখীর মত মাটিতে লুটাইয়া অতসী কাঁদিতেছে। কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে স্বপ্ন-শেষের অধরস্পর্শের সেই মরণদশা স্মরণ করিয়া।

বাতাসী বোনকে তুলিয়া বসাইল ঃ—"কি হয়েছে বল। কাঁদছিস কেন ?"

কথা নাই, শুধু ক্রন্দন। বাতাসী ব্যগ্রকণ্ঠে আবার সুধায়, "আঃ বল না, স্বপন দেখেছিস ?"

পিসিমা কহিলেন "ভয় পেয়েছে দেখছিস্ না !—কতদিন বলেছি, অতসী তুই একা শুস নে, একা শুস্ নে। অত বড়াই ভাল নয় আমরা না হয় মুখ্যুসুখ্যু, তাই বলে ভয়-ডর ব্যাপারগুলো তো আর মিথ্যে নয় !"

অতসী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "গঙ্গাজল, আমায় ঠাকুর ঘর থেকে একটু গঙ্গাজল এনে দাও। আমি মুখ ধোব, আমি অশুচি। যাও—এক্ষুনি এনে দাও।"

অতসী পাগল না ক্ষ্যাপা ! তবু আদুরে মেয়ের আবদার রাখিতেই হইবে। ঐ রাত্রেই পিসিমা নিস্তারিণী আলো জ্বালিয়া ঠাকুর ঘর হইতে গঙ্গাজল আনিয়া দিলেন !

আতসী তাড়াতাড়ি মুখ ধোয় !

পরদিন হইতে সুরু হইল অতসীর দ্বিগুণতর তপশ্চর্য্যা। আর স্বামীর ফটো নয়।—সে তাহাকে প্রতারিত করিয়াছে। এখন অতসী কালীয় দমনের ছবি বুকে রাখিয়া ঘুমায়। বিশ্ব যদি বিমুখ, তাহার বঁধুয়া ত আছে। অন্ধকার থাকিতেই বিছানা ছাড়ে। নাম

কীর্ত্তন করিতে করিতে ভোর হয়। সূর্য্য উঠিতেই স্নান সারিয়া লয়। তারপর ঠাকুর ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যায়। তাপসী অতসী মূর্ত্তি স্থির হইয়া থাকে। প্রার্থনার ভাষা নাই, শব্দ নাই, ঠোঁট দুটি শুধু অশ্রান্ত নড়িতে থাকে গোপন মনের বাহন হইয়া।

পূজা শেষ করিয়া বাহিরে আসিতে দুপুর গড়াইয়া যায়। স্বপাক ভাতে-ভাত কোন রকমে গলাধঃকরণ করে। এদিকে সন্ধ্যা লাগে। ধূপধূনা জ্বালিয়া প্রদীপ লইয়া, ঘণ্টাখানেক বিগ্রহের আরতি করে।

তারপর আসে নিজের ঘরে। রাত দশটা অবধি শ্রীমদ্‌ভগবতগীতার পাতায় পাতায় ডুবিয়া থাকে। কখনো বা গুণ গুণ করিয়া কীর্ত্তনের সুরে বিচ্ছিন্ন মুহূর্ত্ত গুলিকে একটীর পর একটী করিয়া গাঁথিয়া রাখে মনের মালায়। সারাদিনে বাড়ীতে কার কি হইল, কোথায় কি ঘটিল, কে গেল, কে আসিল,—কোন কিছুর খোঁজেই অতসীর প্রয়োজন নাই। এক বাড়ীতে থাকিয়াও সে যেন এক আলাদা জগতে বাস করে। দিদি বাতাসী, পিসিমা নিস্তারিণী, দাসদাসী, চাকর বাকর সকলের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধটা শুধু মাঝে মাঝে গুটিকয়েক অত্যাবশ্যক নিত্যকর্ম্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

বড় বোন বাতাসীর তৃতীয় সন্তানটি তিন মাসের খোকা হইতে চলিল। অতসী একবার তাকে কোলে লওয়া দূরে থাক্, চোখের দেখাও দেখে না। অথচ এই দিদিকে এবার ছেলে হইতে সেই অত করিয়া পিত্রালয়ে আনাইয়াছিল। দিদির পিঠাপিঠি ছেলে দুইটি সে-ই নাওয়াইত, সেই খাওয়াইত, এমন কি মাঝে মাঝে দ্বিতীয়টাকে রাত্রে তাহার কাছেই নিয়া শোয়াইত। যেন আতুড়ের সময় হঠাৎ মা ছাড়িয়া

ঐ ছোট ছেলেকে নিয়া বিপদে পড়িতে না হয়। আর সে অতসী কিনা আজ দিদির ছেলেকে একবার চোখের দেখাও দেখে না!

অতসী ভাবে, তার অভিসার-পথে এরা মায়া, এরা কণ্টক!—দিদির ছেলে দিদিরই থাক্! তার কি! মাঝে মাঝে তবু কেন ইচ্ছা যায়, বোনপোকে একটিবার কোলে নিয়া দেখে। হঠাৎ কখনো দূর হইতে দেখিয়া বড় সাধ হয়, কোলে তুলিয়া নেয়। পরক্ষণেই অতসী আবার মন শক্ত করে। পরের কথা জানিবার যে অধিকার নাই! মনে মনে গান ধরে—আমি কানু অনুরাগে এ-দেহ সপিনু তিল-তুলসী দিয়া।

সেদিন অনেক রাত্রে তাহাদের নাট মন্দিরে 'ব্রজলীলা' শেষ হয়। অতসী শুইতে গেল। বাকী রাতটুকু তাহার ঘুম হইল না। দিদির কোলের ছেলেটা কেবলি থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিতেছে।—কানের কাছে এমন চীৎকার করিলে কাহারো ঘুম আসে! ঘুমে একেবারে অচৈতন্য! সন্তানের মার নাকি আবার এত ঘুম সাজে!…

ভোর বেলা উঠিয়াই আতসী ভাবিল একবার দিদিকে ভাল করিয়া সমঝাইয়া দেয়, প্রসূতির অমন কুম্ভকর্ণ হইলে চলিবে না। দিদির ঘরের দুয়ারের কাছে যাইয়া কি ভাবিয়া আবার আসে ফিরিয়া।

সারাদিন রোজকার মতই নিত্য কর্ম্মে কাটিয়া গেল। তবু থাকিয়া থাকিয়া কাল রাতের দিদির ছেলেটার কান্না কেবলি কাণের কাছে গুন্‌গুন করিয়া ফিরে। কি উৎপাত! অতসী ঠাকুর ঘরে যাইয়া চোখ বুজিয়া ধ্যানে বসিল। গোপালের ধ্যান মূর্ত্তি আজ যেন বিরস। মুখে তাঁর কেমন এক বিরক্তির চিহ্ন। পূজার টাটখানার সঙ্গে জলভরা

কোথায় ঠোকা লাগিয়া একটা ঘঙ্ করিয়া শব্দ হইল—যেন দিদির ছেলেটারই এক কান্নার টুক্‌রা মুহূর্ত্তে জাগিয়া মিলাইয়া যায়।

বাহিরে আসিয়া আতসী মনে মনে সঙ্কল্প করলে, এবার দিদিকে ঠিক গিয়া শাসাইবে—তোর ছেলে রাত্রিবেলা কাঁদবে, আর বাড়ীর লোক সারাদিনের খাটুনির পর একটু ঘুমুতেও পাবে না!

দিদির ঘরে যাইতে যাইতে অতসী শুনিল ছেলেটা কালকের মতই আবার তেমনি কাঁদিতেছে। দুয়ারের কাছে গিয়া কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়া গেল। শিশু অয়েলক্লথের ছোট বিছানাটিতে নিঃশব্দে ঘুমাইয়া আছে। তবে সে শুনিল কি! অমন ঘুমন্ত খোকন কাঁদিল কখন? থাক্ গে! দিদির ছেলে লইয়া তার এত মাথা ব্যথা কেন!...

সন্ধ্যাবেলা অতসী আজ অনেক্ষণ আরতি করিল। কাঁসর ঘণ্টা মৃদঙ্গের ধ্বনিতে সারা বাড়ী গম্‌গম। ধোঁয়ায় ধোয়ায় ঠাকুরঘর অন্ধকার। যাহারা বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল বিগ্রহের মুখ দেখিতে পাইল না। ধোঁয়া, আর ধোঁয়া। আর, শুধু সাদাথান-পরা অতসীর এক অস্পষ্ট মূর্ত্তি আরতি করিতে করিতে ডাইনে-বামে হেলিয়া দুলিয়া পড়িতেছে।

অতসী এতক্ষণে বাহিরে আসিয়াছে। ঘরে যাইবার পথে দেখিল গ্রামের প্রবীণ ডাক্তার ভুবন বাড়ুয্যে দিদির ঘর হইতে বাহির হইতেছেন।

অতসী ঝি শ্যামাকে আড়ালে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদির ছেলেটার অসুখ করেছে নাকি রে?"

"হ্যাঁ, বড় খোকা দিনুর আজ তিনদিন জ্বর "

"ও দিনু! তা আমায় তো তোরা কিছু বলিস্ নি। আমি ভাবলাম বুঝি ছোট খোকারই কিছু...এ বাড়ীতে আমিও তো একটা মানুষ, আমারও তো তোদের জানানো উচিত।"

খ্যামা অবাক হইয়া অতসীর মুখের দিকে চাহিয়া আছে। হঠাৎ ছোড়দিদিমণির এই রূপ! তাহার উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়াই অতসী নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

ঘণ্টা খানিক বাদে অতসী হঠাৎ বাড়ীর সকলকে অবাক করিয়া দিয়া বাতসীর ঘরে গিয়া হাজির।

"দিনুর নাকি অসুখ দিদি?"

বাতসীও একটু বিস্মিত হয়। আস্তে আস্তে জবাব দেয়, "তিন দিন ধরে জ্বর, সকালেও ছিল—সন্ধ্যের পর ছেড়ে গেছে।"

"এখন ঘুমুচ্ছে বুঝি?"

"হু—তোকে আজ বড় শুকনো দেখাচ্ছে, অতসী"

সে প্রশ্নে অতসীর কান নাই—তাহার নজর ছোটখোকার উপর। বাঃ! কচি কচি হাত-পাগুলি কেবলি নাচে। থামিতে জানে না। কি সুন্দর ঢল ঢল মুখখানি। পুটপুটে ঠোঁট। দুটি নিরীহ মিষ্টি চোখ। নিটোল নিখুঁত ছোট্ট গড়নটি। ঘুমের মধ্যেও কখনো হাসে, কখনো কাঁদে, কখনো আবার একসঙ্গেই হাসি-কান্নার অপরূপ খেলা! চাহিয়া আছে অতসী। স্থির দৃষ্টি।

মুখ তুলিতেই দিদির সঙ্গে চোখাচোখি হয়। কেমন একটু লজ্জা পায়। এখন একবার কোলে না নিলে ভাল দেখায় না। দিদিই বা মনে করিবে কি!"

অতসী ঘুমন্ত শিশুকে কোলে তুলিয়া নেয়।—একেবারে বুকের মাঝখানে। একি! এ যে গোপালের স্পর্শ! আসন করিয়া এমনি ভাবেই না সে ঠাকুর ঘরে দুয়ার বন্ধ করিয়া গোপালকেও বুকে জড়াইয়া ধরে। সেই স্পর্শ। সেই সুখ! সেই পুলক!

অতসী সহসা খোকাকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বড় বোন বাতাসী তো দেখিয়া অবাক। আদর করিতেই বা কে ডাকিয়া আনিয়াছিল, আবার অমন করিয়া অনাদরে বুক হইতে খোকনকে নামাইয়া দিতেই বা কে চাহিয়াছিল!

অতসী সটান ফিরিয়া গেল নিজের ঘরে। দুয়ার বন্ধ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়ে। ...না না, এযে মায়া! এ বুঝি তার পরীক্ষা!—যে-পরীক্ষার ছলে সেদিন তার জীবন-বল্লভ কাছে টানিবে বলিয়াই ঘুমের মধ্যে অমন নিষ্ঠুর অভিনয় করিয়া গেল!......

অতসী হাসিয়া উঠিল......ভেবেছ কি তুমি, আমি কিছুই বুঝি নে? এ পরীক্ষার বুঝি প্রয়োজন ছিল? বেশ ত। আগুন যদি লাগিয়েছ একবার, চেয়ে দেখনা ফল কি হয়। দেখছ না বঁধু,—জ্বলছে, সে জ্বলছে। কাঠ আমার পুড়ছে যত, শিখা ততই বাড়ছে। তারপর একদিন দেখবে প্রিয়তম, বিনা কাষ্ঠেও কেমন করে আগুন জ্বলে। আমার সেই নিকষিত হেম দিয়েই না তখন তোমার গলায় মালা হ'য়ে দুলব। পাথেয় যখন দিয়েছ, তখন আর পথ-বিপথের অমন ভয় দেখাচ্ছ কি!—অতসী হাসিয়া আবৃত্তি সুরু করিল—পাগলের মত।

কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল মঞ্জীর চীরহি ঝাপি
গাগরী বারি ঢারি' করি পিছল চলতহি অঙ্গুলি চাপি
বঁধুয়া তুয়া অভিসারক লাগি !!

গান করিতে করিতেই অতসী ছবির কালীয়দমনকে পাড়িয়া আনে। জানালার কাছে আসিয়া ছবি লইয়া বসে। ছবিকে বুকে রাখিয়া ভাবে কত কথা, কত স্মৃতি।

বাহিরে তখন চৈত্র-শেষের নীলাকাশে জ্যোৎস্নার ভরা জোয়ার। বাতাসে বাতাসে ডালপালাগুলি অস্থির অসংবৃত। অতসী একবার বাহিরে চাহিল। দূরে দৃষ্টি মেলিয়া যেন কাহাকে খুঁজিল। তারপর চোখ দুটি আবার বোজে। তাহার অন্তরের গোপালের সঙ্গে বাহিরের গোপালকে একবার মিলাইয়া লইতে চায়। আবার মেলে চোখ।

অশিষ্ট বাতাসে তাহার বুকের আঁচল সরিয়া সরিয়া যায়, সে যেন স্পর্শ পায় গোপালের। মাথার চুল উড়িয়া পড়ে, ভাব গোপালই বুঝি কৌতুক খেলায় মাতিতে আসিয়াছে। শুক্লা ত্রয়োদশীর ঐ ভুবন-ছাওয়া রূপালী আলো বুঝি তারই গোপালের মধুর হাসির ঝরণা ধারা। আবেশে চোখ বুজিয়া আসে অতসীর। কিন্তু একি! প্রস্তরের গোপাল মূর্ত্তিকে চেতনত্বে রাঙাইতে যাইয়া কে হাসে ঐ, কে কাঁদে? ঐ যে তাহার দিদিরই খোকা। ঐ ত সেই, কিছুতেই না, না, না, ও নয়, গোপালের মূর্ত্তিতে ওতো স্থান পাইতে পারে না। আবার সে গোলালের মূর্ত্তি ধ্যান করিল। এমনি করিয়া কখনো গোপাল কখনো খোকা, অতসীর মনের পটে ক্ষণে ক্ষণে স্থান পরিবর্ত্তন করে।

সব কয়টী জানালা বন্ধ করিয়া এক সময় শ্রান্ত অতসী শুইয়া

পড়ে। শ্রীকৃষ্ণের শতনাম নিতে নিতে চোখের পাতা ভারী হইয়া আসে। বিছানার উপর বুকের কাছে কালীয়-দমনও ঘুমাইয়া আছে।

মাঝরাত্রে এতদিন পরে আবার সেই স্বপ্ন! এবার আর ছায়া-ছায়া স্বামীর আড়ালে নয়, যতীন ঘোষাল একেবারে মুখোমুখি। কিন্তু রূপ বদলাইয়া দেখা দিয়াছে। বিরস, করুণ, অনুতাপদগ্ধ। যেন সে শেষ বিদায় লইতে আসিয়াছে।

অতসী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিতে চাহিল,—পারিল না। ভাঙ্গিল না ঘুম। ধীরে ধীরে যতীন ঘোষাল ছায়া হইয়া মিলাইয়া গেল। তার সেই শূন্য স্থানে কে ঐ? খোকা! দিদির কোলের ছেলে! হাসিতেছে গোপাল, আর হাসে ঐ শিশু। গোপালকে অতসী আলাদা করিয়া নিতে চায়, পারে না; একদৃষ্টিতে যে দুজনেই ধরা পড়ে! পৃথক করিবে সে কেমন করিয়া! উভয়েই এক সঙ্গে হি হি করিয়া হাসিল, অ অ অ করিয়া কত অবোধ্য কথা বকিল। ও কি! খোকা··· গোপাল ঐ কার কোলে? এ কে? এতকাল ধরিয়া মনে প্রাণে কানে শোনা সেই ভাগ্যবতী যশোদা মূর্ত্তি! অতসী ছুটিয়া গেল। পৌঁছিতে পারিল না। হোঁচট খাইয়া পড়িয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল মাঝপথে।

স্বপ্নের ঘোর কাটাইয়া অতসী উঠিয়া বসিল বিছানার উপর। স্বপ্ন! ছলনা! মায়া! সে ভুলিবে না। এ-পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হইবেই। নগণ্য যতীন ঘোষাল! তুচ্ছ দিদির ওই ছোট খোকা! গোপাল,—শুধু গোপালকেই তাহার চাই। শুধু সে আর গোপাল, গোপাল আর সে। সমগ্র জগৎ বাহিরে পড়িয়া থাক্।

বাহিরে তখন দুর্য্যোগের রাত্রি। ভীষণ ঝড় উঠিয়াছে। নিশ্ছিদ্র

নিরেট অন্ধকার। থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুৎ-চমক। গুম গুম গর্জ্জন। জানালার খড়খড়িগুলি এই বুঝি ভাঙ্গিয়া পড়ে। উন্মত্ত বাতাসের হুস্ হুস্ শব্দ—যেন রুষিয়া ফুঁসিয়া উঠিতেছে যুগযুগান্তের সহস্র সহস্র কালিয়ার ক্রুদ্ধ ক্রূর ফণা।

অতসী একটা জানালা খুলিল। উঃ কি ঝড়! জলের ঝাপটায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গেল। অতসীর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই।

ঐ সূচীভেদ্য অন্ধকারে কি যেন সে দেখিতে চায়। মেঘের ঐ গুরু গর্জ্জনে কে বুঝি ডাক দিয়াছে। আকাশ-ভাঙ্গা মুষলধারায় কার যেন পায়ের ধ্বনি শোনা যায়। অতসী চাহিয়া আছে।—হ্যাঁ, তুমি আবার আসবে আজ। আজই আসবে। তাই না আমার শেষ পরীক্ষার দিনটিতে তুমি এসছো ভীমা ভৈরবী হয়ে। জীবনবল্লভ, স্বপ্নে যদি আজ এত কাছেই এসেছিলে, জাগরণে এখন আর দূরে যেতে দেবনা। আজই তোমায় চাই। দুর্য্যোগের সম্মুখে দাড়াইয়া উন্মাদিনী অতসী গান ধরিল, লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু······

গান থামাইয়া আবার ভাবে, আমি তো প্রস্তুত। এসো তুমি ভুবনমোহন দর্পহারী ভগবান! এসো এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ অন্ধকার পটভূমিতেই আজ তোমায় আমায় মিলন হ'ক। এই মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে আজ সুরু হক্ আমার নব জন্মের চির অভিসার। এস তুমি,—এস···

গান থামে। ঝড় থামে না। অতসী তেমনি দাঁড়াইয়া আছে ঃ—
—তবে তুমি আসবে না? তুমি কি এতই নিষ্ঠুর হবে? সহসা অতসী উন্মত্ত ঝড়ের মুখোমুখি বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল। কাঁদিয়া কাঁদিযা গাহিয়া চলিল—ভাষাহীন সুরহীন দুরন্ত উচ্ছ্বাস ;

.........না, ঐ তো বিদ্যুতে তার হাসি, এই অন্ধকার যে তাঁর অতল কালো চোখেরই চাউনি। সে আসবে, ঐ সে আসছে।

বিদ্যুৎ চম্‌কাইল। সেই এক মুহূর্ত্তের আলোকে অতসী দেখিল জানালার কাছে বাত্যাবিক্ষুব্ধ অসহায় নারিকেল গাছটির মাথায় যেন যতীন ঘোষালের করুণ কাতর মুখচ্ছবি। পরক্ষণে আবার বিদ্যুৎ, এবার দেখিল গাছের কচি কচি নারিকেলগুলির গায় যেন বড় বোন বাতাসীর কোলের খোকনের হাসি মাখান।

আতসী কাঁদিয়া উঠিল। ওগো আর কত পরীক্ষা করবে। এবার এস। ঐ যে ডাকে। এসেছ তবে? হ্যাঁ ঠিক, ঐ যে ডাকে।

পাশের ঘরে বাতাসীর কোলের ছেলে কাঁদিয়া উঠিয়াছে। অবিরল বৃষ্টিধারার মধ্যেও শিশুর অস্পষ্ট ক্রন্দনধ্বনি এ-ঘরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।......

ঐ যে ডাকে, মেঘের মধ্যে, অন্ধকারের বুক চিরে, বৃষ্টির ঝাপটায়, বাতাসের হতাশ্বাসে।—হ্যাঁ, কেঁদে কেঁদে ডাকছে আমায়, শুনতে আমি ভুল করিনি।

অতসী জানালার সম্মুখে তেমনি দাড়াইয়া চোখ বুজিল। বিস্রস্ত এলোচুল, স্খলিত অঞ্চল, আপাদশির জলসিক্ত। চোখ বুজিয়াছে, বাহিরের ঐ ডাককে মনেপ্রাণে গ্রহণ করিবে মহাকালের বুকের এই গুটিকয়েক মুহূর্ত্ত দিয়া।...ঠিক! সেই শব্দ!—সেই ক্রন্দন!... উৎকর্ণ অতসী কি শুনিয়া যেন শিহরিয়া উঠিল। গুঞ্জরিয়া উঠিল তাহার সারা অস্তিত্ব। তাহার আদ্যন্ত যেন এক নিমেষে জুড়াইয়া গেল। ছুটিয়া গেল দুয়ারের কাছে।

ওদিক হইতে দুয়ার বন্ধ। বাহিরে বৃষ্টি আর মেঘের গর্জ্জন তেমনি চলিতেছে। অতসী দুয়ারের পিঠে ধাক্কা দিতে দিতে চীৎকার করিয়া ডাকিলঃ "ও দিদি! দোর খোল, শিগ্‌গির দোর খোল। আমাকে গোপালের কাছে যেতে দে। সে আমায় ডাক্‌ছে, সে আমায় ডাক্‌ছে।"

আলো জ্বালিয়া বাতাসী দুয়ার খুলিল। অতসীর ঐ আলুথালু উন্মাদিনী মূর্ত্তি দেখিয়া সে রীতিমত ভয় পাইয়াছে। ডাকিল, "ও পিসিমা শিগগির ওঠ, ছাখ এসে......"

"ভয় নেই। আমি পাগল হই নি দিদি! একবার আমায় গোপালের কছে যেতে দে," বলিতে বলিতে অতসী বিছানার কাছে আগাইয়া গেল।

ও বিছানা হইতে এতক্ষণে পিসিমা নামিয়া আসিয়াছেন। এ বিছানায় বাতাসীর দুটি পিঠাপিঠি ছেলে ঘুমাইয়া আছে। অতসী যাইয়া ঐ ভিজা কাপড়েই ছোট খোকাকে কোলে তুলিয়া নিল। শিশু তখনো থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিতেছে।

বাতাসী ও তার পিসিমা আসিয়া পিছনে দাঁড়ায়। তাহাদের ভয় এখনো কাটে নাই।

"একখানা কাঁথা দে দিদি। আমার যে সব ভিজে গেছে দেখছিস না?"

কাঁথা দিয়া খোকাকে জড়াইয়া লইয়া অতসী তাহাকে বুকের কাছে তুলিয়া নিল। শিশুর কপালে আলগোছে একটু চুমু খাইয়া ডাকিল: "কাঁদছ কেন গো গোপাল আমার? এই যে আমি এসেছি। আর তো আমার কোন ভয় নেই।"

শিশু এবার কান্না থামাইয়াছে। অবাক হইয়া বাতাসী আর পিসিমা

পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল। বাহিরের মাতামাতিও এতক্ষণে থামিয়া আসিয়াছে।

"তোর তো আরো একটি আছে দিদি, গোপালকে আমায় দিয়ে দে না। আমিই ওকে মানুষ করব। আজ থেকে ও আমার।"

"তুই আগে কাপড় ছেড়ে ফ্যাল অতসী।"

"না না—আগে আমার গোপাল ঘুমুক।" খোকার কচি মুখে আর একবার চুমু খাইয়া অতসী কহিল "দিদি, তোর—না না আমার এ ছেলের নাম রাখলাম কালীয়দমন। বুঝলে পিসিমা—আমার গোপালের নাম কালীয়দমন।"

অকালবোধন

কাল থেকে পূজার ছুটি। পরশু সকালে 'চিটাগং-মেলে' রওয়ানা হইব। মাত্র সাত দিনের ছুটি।

পরশু দিন বাড়ীর চিঠি পাইয়াছি,—স্ত্রীর চিঠি। লিখিয়াছে, কোলের ছেলেটা নাকি 'বাবা' বলিতে শিখিয়াছে, আর ছোট মেয়ে পুঁটির ডান হাতে একটা ফোঁড়া হইয়াছে।

বয়সের মাপকাঠিতে স্ত্রীর আমার যৌবন না-কি অনেকখানিই অবশিষ্ট আছে। তবু বহু আগেই সে 'প্রিয়তমা' হইতে 'কল্যাণীয়াসু' হইয়া গেছে। সুতরাং আর ভয় নাই সেখানে।

বিপদে ফেলিয়াছে আমার এগার বছরের বড় মেয়ে মিনি। গেল বড়দিনের ছুটিতে তার মায়ের অসাক্ষাতে আমার কানে-কানে ফরমাশ করিয়াছিল, "আসছে পূজোয় মুখুজ্যেদের খেঁদীর ভায়লা শাড়ির মত আমায় একখানা শাড়ি দিও বাবা—কি যে ছাই কাপড় আন তুমি! ও কি পরা যায়—ছালার চট।"

গরীবের ঘোড়া-রোগ! তবু পিতা আমি। কথা দিয়াছিলাম। তখন কি আর জানিতাম আমার ইহলোকের ভাগ্য-বিধাতা একটি কলমের

আঁচড়ে আমার পঞ্চাশকে চল্লিশে নামাইয়া দিবেন! যাক্, শুধু— চাকুরীটা বজায় আছে।

মিনির ভায়লা শাড়ী! সে আর এবার না।

মেসের পাওনা, চাকরটার পূজার বকশিস, সংসার-খরচের মাসিক টাকাটা, আমার যাতায়াতের রেল-ষ্টীমার ভাড়া, এ সব ধরিয়া মোটে সাত টাকা অবশিষ্ট থাকে। তাহাই লইয়া সন্ধ্যার পর বাহির হইয়া পড়িলাম। ছেলে মেয়েদের জামা-কাপড় কেনা আজই সারিয়া রাখি।

পূজার বাজারে রাজধানী কলিকাতা আজ নানা ছাঁদে সাজিয়াছে। দোকানে দোকানে সাজানো শো-কেস্। আলোগুলির শক্তি বাড়িয়াছে চারগুণ। চোক ধাঁধায় রাস্তায় জনতার জোয়ার ঠেলিয়া চলিতে হয়। রাত এগারটার আগে ভাঁটা দেখা দেয় না।

পূজা সেল্! পূজা সেল্! রক্তের মত লাল কাপড়ে সাদা হরফের শুভ আমন্ত্রণ ঝুলিতেছে।

কলেজ ষ্ট্রীটের দুই পাশে বুইক্, প্লিমাথ, ক্যাডিলাক, বেবি অষ্টিন্ সার দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। টালা হইতে টালিগঞ্জে বড় ঘরের গৃহলক্ষ্মীরা দেখিয়া শুনিয়া পছন্দ করিয়া পূজার বাজার করিতে আসিয়াছেন।

চোক্ ঝলসানো শো কেস্। কাচের মধ্যে ঢাকাই, কাশ্মীরী, ফরাসডাঙ্গা, ভাগলপুরীর জড়াজড়ি; নীল, ফিকে-নীল লাল, গোলাপী, বেগুনী, ফিরোজার ঝলমলানি; ভাঁজ-করা মুগা-তসর আর ভাঁজ খোলা সিল্কের বিক্ষিপ্ত বিন্যাস। জরির জ্যাকেট, বিবির ব্লাউস, পরীর পোষাক! জলুষের জলুসা! উগ্র আলোয় কাচের কারাগারে বন্দী হইয়া আছে যেন কামনার শিল্প সুন্দরীরা। ঐ ভঙ্গুর ব্যবধানটুকু তো এক

নিমেষে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে জানি! মোড়ে ঐ পুলিশ খাড়া আছে না?

মিনির ভায়লা শাড়ী। ঐ সিল্কের শাড়ীখানার দামটা লেখা আছে কত? আঠার টাকা! গত সপ্তাহে বৌবাজারের গির্জ্জার লটারীর যে টিকিটখানি কিনিয়াছিলাম তার নম্বর—ডি, ৩০৯। ঠিক মনে আছে। ড্রইং ২৮শে নভেম্বর।

'শ্যামবাজার, বাবু শ্যামবাজার, তিন পয়সা।' লোকটার নির্ঘাত যক্ষ্মা হইবে। এত জোরেও কখনো চীৎকার করে!

হুঁ, শুধু আমি একাই বুঝি! শো-কেসের সামনে দাঁড়াইয়া সতৃষ্ণনয়নে আরও ত কত লোক। কিনিবার জন্য দেখিতেছে না নিশ্চয়ই। আমারই সগোত্র। আমারই মতন লটারীর টিকিটে দুর্গা, কালী, হরি, লক্ষ্মী ছাড়িয়া, তার পর মিনি, পুটি, খোকন, সরযূ শেষ করিয়া অবশেষে হতভাগা, অলক্ষ্মী, আন্‌-লাকী প্রভৃতি নম-ডি-প্লুম ওরাও বুঝি লিখিতে সুরু করিয়াছে।

পূজা সেল! পূজা সেল! রক্তের মত লাল কাপড়ে বড় হরফের শুভ আমন্ত্রণ।

ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটী হইতে কাপড় কিনিয়া ভিড় ঠেলিয়া বাহিরে আসিলাম। পুরানো পাঞ্জাবীটা ভিজিয়া শপশপে।

আর ঘণ্টা পঁয়ত্রিশেক। পরশু সকাল সাতটায় চিটাগং-মেলা খোকা না-কি 'বাবা' বলিতে শিখিয়াছে।

বেলা পাঁচটায় ষ্টীমার ছাড়িয়া নৌকায় উঠিলাম। বাড়ী পৌঁছিতে ঘণ্টা-তিনেক লাগিবে।

নৌকা চলিয়াছে পদ্মার কোল ঘেষিয়া। রাক্ষসী এখন ধ্বংসলীলায় পরিশ্রান্ত হইয়া পাড় হইতে অনেকখানি নামিয়া আসিয়াছে। তটপ্রান্ত ধরিয়া সর্ব্বনাশীর নিষ্ঠুর অত্যাচারের করুণ কাতর আঘাতচিহ্ গুলি হাঁ করিয়া আছে। একটা দালানের অর্দ্ধেকই ধ্বসিয়া গিয়া ইট-বারকরা বাকী অর্দ্ধেকও আধমরার মত চুপ করিয়া রহিয়াছে। ঐ অশ্বথ গাছটা ভিত্তি-মূল একেবারে ঝাজরা হইয়া গেছে! স্নেহার্দ্র মৃত্তিকা তবু তাকে আক-ড়াইয়া ধরিয়া মৃত্যুর হাত হইতে অন্ততঃ এবারের মত বাঁচাইয়া রাখিল। ও-বাড়িটার উঠানের অর্দ্ধেক নাই, এ-গ্রামের জেলেপাড়াটাই শুধু বাকী। এখানে সেখানে মেটে হাঁড়ি-কলসীর টুকরাগুলি ছড়াইয়া আছে। দেখিতে দেখিতে চলিলাম স্থিতির ক্ষণভঙ্গুরতা। দুর্ব্বার গতিমুখে স্থাবর-অস্থাবরের নিরুপায় আত্মসমর্পণ! এবার বর্ষায় কি ভাঙ্গাটাই না ভাঙ্গিয়াছে!

পদ্মা এখন নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। তার বিস্তীর্ণ বুকে দূরে দূরে পাল তুলিয়া চলিয়াছে ছোট-বড় ডিঙ্গিগুলি। নির্ম্মেঘ আকাশের কোলে দল বাঁধিয়া এক ঝাক বক দিয়াছে এপার-ওপার পাড়ি। মিনিদের কাপড়ের পাড়গুলি আর একটু ভাল দেখিয়া কেনাই উচিত ছিল।

নদী ছাড়িয়া নৌকা এবার খালের মুখ ঢুকিল।

মাঠের জল প্রায় নামিয়া আসিয়াছে। শূন্য পাটের ক্ষেতে এখানে-

সেখানে কচুরি-পানা জমা হইয়া আছে বিস্তর। সামান্য বাতাসেই ধান-ক্ষেতে খস্‌খস্‌ শব্দ। বাঁ-দিকের গ্রামটার শেষে গাছের সারে দোয়েল শ্যামা শিস্‌ তুলিয়াছে। খালের ডান পাড়ের ঐ মাদার গাছটায় খঞ্জনটা নাচিতেছে তবেশ! বেত-ঝোপের আড়ালে একটা ডাহুক আছে গা ঢাকা দিয়া খালের বাঁকে আড়াআড়ি-পাতা গড়াটার কাছে একটা লোক গোটাচারেক ছিপ ফেলিয়া বসিয়া আছে মাছের আশায়।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের তেতালা মেসের স্যাঁৎসেঁতে মেঝে ছাড়িয়া একেবারে পূর্ববঙ্গের শারদ প্রকৃতির মাঝখানে! পাশের বাসার দোতালায় সেই কুঁদুলে বউটার তোলা-উনুনের ধোঁয়ার হাত হইতে দিন কয়েকের জন্য রেহাই পাওয়া গেল। কাল রাতে গলির বাঁকে কুলপি বরফের বিশ্রী হাঁক, আজই গাছের ফাঁকে শালিকের অশ্রান্ত কিচির মিচির। সকালের জল কাদায় কুশ্রী কালো মিরজাপুর ষ্ট্রীটের পরিবর্ত্তে বিকালেই দেখি, ঘোমটা-খসা সুকেশীর সরল সিঁথিরেখার মত ধানক্ষেতের বুক চিরিয়া একটানা 'দাঁড়া'টি আঁকিয়া-বাঁকিয়া চোখের আড়াল হইয়া মিলাইয়া গেছে নিকটেই। ওঃ, মিনি?—ভায়লা শাড়ী তাকে সামনের বছরই কিনিয়া দিব।

খালটি এবার মাঠ ছাড়িয়া একটি গ্রামের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। একটা বড় বাড়ীতে পূজার ব্যস্ত আয়োজন, মণ্ডপে কুমার প্রতিমার চক্ষুদান করিতেছে। সামনের বাড়ীটায় তিন ভিটায় তিনখানি বড় টিনের ঘর, খালের দিকটা লাউয়ের মাচায় আর কুমড়ার ঝোঁকায় ঢাকা পড়িয়াছে। লতাইয়া-ওঠা ডাঁটাগুলির ফাঁকে ফাঁকে উঠানের মাঝখানটা

চোখে পড়ে স্পষ্ট। আট-দশটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে হাত-ধরাধরি করিয়া বৃত্তাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্বরে গাহিতেছে—।

হাঁটুখানি পানি' ঝাকর ঝানি।

হাঁটুখানি পানি' ঝাকর ঝানি।

নৌকা এবার দুইটি খালের মুখে আসিয়া বাঁ-দিকে মোড় ফিরাইল। ডানদিকের খাল ধরিয়া উমেদপুর বাজারের পাশ দিয়া আবার নদীতে পড়া যায়।

ছেলে-মেয়েগুলির সম্মিলিত ছড়া-গান ক্রমশ অস্পষ্ট হইয়া মিলাইয়া যাইতেছে। কথাগুলি আর বোঝা যায় না। শুধু সুর বাজে কানে,— হাঁটুখানি পানি ঝাকর ঝানি, হাঁটুখানি পানি ঝাকর ঝানি······

চোখ-গেল পাখীটা যদি এখন থাকিত, আর ডাকিয়া উঠিত একটি-বারের জন্য বৌ-কথা-কও বঁধুটি, তবেই না আজ কলিকাতা হইতে দু'শ মাইল দূরের এই প্রশান্ত পরিবেশটি পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিত। কোকিলের ডাক যে কতকাল শুনি না! পানকৌড়ি ত গড়ের মাঠে চোখে পড়ে না। গোলদীঘির জলের উপর কি আর মাছরাঙা উড়িয়া বেড়ায়! এরা সব গেল কোথায়? আজ আমি সবাইকে চাই,—সবাইকে,—আমার শৈশবের নাম-জানা, নাম না জানা বিজাতীয়, বিভাষায় সকল পরিচিত-অপরিচিত বন্ধুদের!

সন্ধ্যা হয়-হয়। মাঠের ওপারে বৃক্ষশ্রেণীর ঘনায়মান আবছায়ার অন্তরালে দিনান্তের সোনার থালাখানি পড়িল ঢলিয়া। ঘরে ঘরে বাতি জ্বলিল। রান্নাঘরে মিটি মিটি করে কেরোসিনের ডিবা।

এ পাড়ার পূজাবাড়ীতে ঢাক বাজিয়া উঠিয়াছে। ভিন্ গাঁয়ের কাঁসর-

ঘণ্টাগুলির শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়। কাল পূজা। আজ বোধন। দু-দিনের আনন্দরোল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমিও ত বাড়ি পৌঁছিব। খোকা না কি বড় দুষ্টু হইয়াছে।

বিপরীত দিক হইতে একটা নৌকা আসিয়া পড়িয়াছে। কেরোসিনের ডিবার আলোয় ভাল করিয়া কিছু দেখা যায় না।

আমার মাঝি হাঁকিল, "আপনা ডান?"

ও নৌকা হইতে জবাব আসে—"আপন ডান।"

এ-তো আর কীপ-টু-দি-লেফট মানিয়া চলা কলিকাতার রাজপথ নয়। শীর্ণ খালের সর্পিল পথে অন্ধকারে এরা চিরকালই ডান-হাতি চলে।... পুঁটির ডান হাতের কোঁড়াটা বোধ হয় এতদিনে সারিয়া গিয়াছে।

বিপরীত দিক হইতে আর একখানি নৌকা আসিল। আমার মাঝি প্রশ্ন করে, "ও ভাই, ঝাউপাড়ার খালের মুখে নৌকা উঠবে ত?"

উত্তর আসিল, "একটু ঠেক্‌তে পারে।"

"টেনে নেওয়া চলবে তো?"

"ক'জন লোক?"

"একজন"।

"তা হ'লে জলে নামতেও হবে না—কোন্ গাঁয়ে যাচ্ছ ভাই?"

কথার জবাব দিয়া মাঝি লগি বাহিয়া চলিল। চোখের পাতা ভারী হইয়া আসিয়াছে—তবু কানে বাজে সেই অর্থহীন আবর্ত্ত-নৃত্য: হাটখানি পানি ঝাকর ঝানি......

মাঝির ডাকে ঘুম ভাঙ্গিল। চাহিয়া দেখি, চৌধুরীদের বাহির-বাড়ীর ঘাটে নৌকা ভিড়িয়াছে।

আমার ডাক শুনিয়া মিনি টিমটিমে হ্যারিকেনটা হাতে বাহিরে ছুটিয়া আসিল। তার পিছু পিছু শিথিল আঁচলটা মাথায় তুলিতে তুলিতে মিনির মা-ও।

সাড়া পাইয়া অপর সরিকের ঠানপিসিমা আসিলেন, আসিলেন তারিণীখুড়ো ও তাঁর বড় ছেলে মন্টু। পাশের বাড়ীর সম্পর্কিত মহিমদা আর পদ্মপিসিমা আসিলেন। আমাদের পুকুরের কোণে ধোপাবাড়ীর নন্দা আসিয়া হাজির। প্রণাম করিয়া ও প্রণাম পাইয়া কুশল-প্রশ্নাদির পর্ব্ব শেষ করিলাম।

শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের দোতলা মেস-বাড়ীটার চল্লিশ টাকার কেরাণী নহি আর: এখন আমি দস্তুরমত একটা পারসোন্যালিটি!

বিছানা বাক্স ঘরে তুলিয়া মাঝিকে বিদায় দিলাম। মিনি আমার জুতার ফিতা খুলিয়া দিল। বালতির জলে পা ধোয়াইয়া গামছায় পা মোছাইল। মেয়ের আমার মুখে-চোখে আনন্দ আর ধরে না।

মিনির মা তার চাবিছড়া-বাঁধা আঁচলখানি গলায় জড়াইয়া আমার পায়ের ধূলা নিল।

কহিলাম, "বড্ড যে রোগা হয়ে গেছ।"

"বুড়ি হয়ে গেলাম—" বলিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া মুখ ফিরাইল। আজকের মিনির মা'র মধ্যে বিশ বছর আগেকার সরযূ হঠাৎ একটু জাগিয়া উঠিয়া আবার মুহূর্ত্তমধ্যে মিলাইয়া গেল। জোয়ারজলে ভাটার ডাক আসিয়াছে বটে, যাই-যাই করিয়া যাইতে এখনো কতকটা দেরী আছে তবে!

সরযূ চৌকির কাছে গিয়া ডাকিল, "ও খোকন, ওঠ!—ও পুঁটি, ওঠ দ্যাখ, কে এসেছে!"

"থাক্ না, ঘুমুক," বলিয়া আমি চৌকির দিকে আগাইয়া গেলাম। বাঃ! দুটি শুকতারা যেন অঘোরে ঘুমাইয়া আছে। খোকনের কপালের উপর আলগোছে একটি চুমু খাইলাম—কেরাণী-পিতার স্পর্শ আশীর্ব্বাদ।

সরযূ কহিল, "পুঁটি কি আজ ঘুমুতে চায়! কেবলই—মা, বাবা আসবে কখন? কই এল না ত! এতক্ষণ থেকে থেকে এই তুমি আসবার একটু আগে ঘুমিয়ে পড়েছে।"

"ওর ফোঁড়া সেরেছে ত?"

"হ্যাঁ।"

মিনি বলিয়া উঠিল, "বাবা, খোকনমণি আমাদের হাঁটতে শিখেছে,—দেখবে কাল।"

"তুমি এখন শোও গে যাও।"

"আমার এখনো ঘুম পায় নি বাবা, শোব'খন পরে।"

"না মা, রাত অনেক হয়েছে। অসুখ করবে যে," বলিয়া মিনির মাথায় ডানহাতখানি রাখিলাম। তাই ত! মিনি যে বড় হইয়া উঠিতেছে! খোকনটা বড় ভুল করিয়া ফেলিয়াছে। এগার বছর আগে [illegible] আসা উচিত ছিল। মিনির ত আজ আসিলেও চলিত। ভায়লা শাড়ীর ফরমাইস দু-বছর পরে হইলেও ক্ষতি ছিল না। আগাগোড়াই যেন কেমন এক গরমিল হইয়া গেছে।

ঘরের মেঝেতে ভাত বাড়িয়া ঢাকা দিয়া রাখিয়াছে। সামনে ঠাকুর-দাদার আমলের কাঠের পিঁড়িখানি পাতা। গাড়ু ও খড়মজোড়া যথাস্থানে

সাজান। ছোট একটি পিতলের প্লেটে গুটি কয়েক পানের খিলি। পাশেই কাঁসার পিক্‌দানিটা। জলচৌকির উপর শুক্‌নো গামছাখানি ভাজকরা। কে বলে কেরাণী,—আমি মহারাজ, অন্ততঃ আজ একটি রাত্রে।

খাইতে বসিয়াছি। পাতের কাছে গোটা-পাঁচেক ছোট বড় বাটি। বাটির চাপে গোল করিয়া বাড়া ভাত একটু একটু গরম আছে এখনো। উড়ে ঠাকুরের ঘ্যাঁট-খাওয়া মুখে শুক্তো-চচ্চড়ি গোগ্রাসে গিলিতে লাগিলাম। সরযূ সামনে বসিয়া আমাকে পাখার বাতাস করিতেছে। এটা খাও, ওটা খাও, আর একটু' যেন পেটে না ধরিলেও অনুরোধে গিলিতেই হইবে।

আজ আমি শাহান-শা বাদশা, সাম্রাজ্য আমার ষোল হাত দৈর্ঘ্য ও এগার হাত প্রস্থের এই করোগেট-টিনের গৃহটি ঐ ত রাজমহিষী সামনে বসিয়া পাখা হাতে, পরণে তাহার আধময়লা আটপৌরে শাড়ী, মণিবন্ধে দু জোড়া শাঁকার চুড়ি, কপালে লাল ডগ্‌ডগে সিঁদুরের ফোঁটা, সিঁথিমূলে জল্‌জল্‌ করে এয়োতির গর্ব্বচিহ্ন। কে বলে আমি সওদাগারি আপিসের চল্লিশ টাকার কেরাণী! আমি রাজাধিরাজ, অন্ততঃ এই একটি রাত্রে।

ভোজনান্তে পান চিবাইতে চিবাইতে বিছানায় গা এলাইয়া দিলাম। বড় আরাম! শুইয়া থাকিয়া স্ত্রীর মুখে গত নয় মাসের তেতো-মিঠে ইতিহাস শুনিতে লাগিলাম। মুখুজ্যে-গিন্নী রাঙা টুকটুকে পুত্রবধূ ঘরে আনিয়াছেন, হরিশ দত্তের এবার চার মেয়ের পর ছেলে হইল, গরিবী বিপদ আর সহ্য করা যায় না, টিনের চালার মাঝে মাঝে ফুটা হইয়া

গেছে—এবার না সারাইলে সাম্নের বর্ষায় ছেলেপিলে লইয়া জলে ভিজিতে হইবে—আরও কত কি !

অবশেষে মুখভারের ভান করিয়া কহিল, "তোমায় আর কি, তুমি ত দূরে সরে আছ নিশ্চিন্তে—ঝঞ্ঝাট যত আমারই।"

কহিলাম, "আর ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে না। এবার তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি। একটি ঘর ঠিক করে এসেছি—বারো টাকা ভাড়া।"

কথাটা বিশ্বাস করিল না। কহিল, "হঁ্যা; কতবারই অমন নেব-নেব করলে! কথায় বলে, পাপী যাবে গঙ্গাস্নান, কাঁটা কুড়োবে কে।"

"না গো, সত্যি তোমাদের নিয়ে যাবো এবার। মা তাঁর শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে যেতে চাইতেন না, নইলে তো কবেই তোমাকে নিয়ে যেতাম।"

সরযূ চুপ করিয়া রহিল। এবার বোধ করি বিশ্বাস করিয়াও অবিশ্বাসের ভাব দেখাইতেছে।

হাসিয়া কহিল, "বিশ্বাস হচ্ছে না, না ?"

গম্ভীর হইয়া কহিল, "মা কালী কি আমায় টান্‌বেন—"

হাসিয়া কহিলাম, "পুণ্যের জোর থাকে ত অবশ্যি টান্‌বেন।"

সরযূ খানিক চুপ থাকিয়া কহিল, "কিন্তু আমাদের ঘর দোর দেখ্‌বে কে ? সব যে যাবে নষ্ট হ'য়ে, লুটেপুটে খাবে ও-ঘরের [illegible]"

অপর শরিকের উপর ঝাঁজ তাহার কম নয়। আমি [illegible] কহিলাম, "সে চিন্তা ক'রো না, আমি সব বন্দোবস্ত করব। বিপিন লোধ আজ দু-বছর ধরে একটু জমি চাইছে। সে তার পরিবার নিয়ে বাড়িতে থাকবে, তদারক করবে, ফল-ফুলুরি সব খাবে-দাবে। [illegible] পেলে সে এক্ষুনি দৌড়ে আসবে।"

তবু সে চুপ করিয়া আছে।

হাসিয়া কহিলাম. "বড্ড রোগা হয়ে গেছ সরু।"

"চুলও পেকেছ গো। রাত্রিবেলা দেখা যায় না, কাল সকালে দেখো," বলিয়া নিজের রসিকতায় নিজেই খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আমিও হাসিয়া তাহার মুখের বেড়টি তুলিয়া ধরিতেই সে বিছানার উপর মাথা নোয়াইল লজ্জায়। আমার বিশ বছরের পরিচিতা প্রিয়া হঠাৎ কেমন যেন এক নব-পরিচিতের মত মনে হইল। বিরহের পর মিলন-লগ্নের সহাস সুন্দর লজ্জাভূষণ ত এ নয়, সে মধুময় অভিজ্ঞতা আমার জীবনে কতবারই না ঘটিয়াছে। এ যে সম্পূর্ণ নূতন! একি পড়ন্ত বয়সের প্রকম্পিত ছায়া? না, পতি-পত্নীর মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে মাতৃত্বের সহজ স্বাভাবিক ব্যবধানটুকু? ঐ ত আমাদের উভয়ের সম্মিলিত জীবনের অবিচ্ছেদ্য সীমান্তখানি,—সারি সারি শুইয়া আছে ঐ ত মিনি, ঐ যে পুঁটি, ঐ যে আমাদের শিবরাত্রির সলিতা খোকনমণি!

সরযূ ডাকিল, "ওগো শুনছ?"

"কেন?"

"মিনি ত বড় হয়ে উঠল—এখন থেকে..."

"ক্ষেপেছ! একরত্তি মেয়েকে তুমি যে জোর করে ডবল প্রমোশন দিতে চাও গো। সর্দা-আইনের সীমানা পার হ'তে এখনো চার-পাঁচ বছর বাকি আছে ওর।"

"এখন থেকে খোঁজ-খবর করতেই সময় হ'য়ে যাবে।"

বুঝিলাম প্রসঙ্গটা সহসা থামিবে না। কহিলাম, "কাল তোমার

কথা শুনব সরু। শেয়ালদা থেকে গোয়ালন্দ অবধি ঠায় দাঁড়িয়ে এসেছি। একটুও বসতে পারিনি।"

"না, আমি আর কথা বলব না। তুমি ঘুমোও—অমি তোমার টিপে দি—তাড়াতাড়ি ঘুম আসবে'খন।"

খানিক বাদে সরযূ আমার পায়ের নখগুলি খুটিতে খুটিতে কহিল, "ঘুমুচ্ছ?"

চোখ মেলিয়া হাসিয়া কহিলাম, "এই না বল্‌লে কথা বলবে না..."

"একটা কথা শুধু। তারপর আর বলব না। দেখ, তুমি আর—শুনছ ত?"

"হ্যাঁ গো।"

"—তুমি আর মিনির সামনে আমায় 'সরু' বলে ডেকো না যেন।"

"তবে কি বলে ডাকব?"

"কেন—মিনির মা।"

"আচ্ছা, তাই হবে।"

মাঝ রাতে জাগিয়া দেখি, সরযূ আমার পায়ের তলায় ঘুমাইয়া আছে। শিথিল খোঁপাটি আমার পা ছাইয়া ছড়াইয়া গেছে।

ঘুমাইয়া আছে সরযূ, না না মিনির মা। বেসুর সেতার, বিমনা

সেতারী। স্বুক-সারী আজ শুর ভুলিয়াছে। অতীতের কুহেলিগুণ্ঠন ছিঁড়িয়া উঁকি দেয় দু-চারিটি স্মৃতিমধুর মধ্যরাত্রি।

এ তো বিদায় নয়, বিচ্ছেদ নয়, ব্যবধান নয়! এ যে নূতন করিয়া আর এক অরুণোদয়ের পূর্ব্বাভাস,—আর এক নূতন জীবনের। এতদিন ছিল বিস্তার, আজ আসিতেছে গভীরতা যেন। প্লাবন গিয়াছে নামিয়া, আজ দেখি ভারে ভারে পলিমাটি জমা। পুষ্পের এখন ফল-পরিণতি! সরস্বুর বিদায়, মিনির মাঁ'র উদয়!

তবু এ যে, গরীবের ঘরে, অকাল বিসর্জ্জন!

সকালে ঘুম ভাঙ্গিতেই দেখি তিন ভাই বোন নূতন কাপড়-জামা লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছে। পুঁটি শক্ত করিয়া খোকনকে ধরিয়া রাখিয়াছে, আর মিনি ছোট ভাইটির বিস্তর আপত্তির বিরুদ্ধে জোর করিয়া তাহাকে রঙীন ফ্রকটা পরাইতে ব্যস্ত। শিশু খানিকক্ষণ আপত্তিসূচক ক্রন্দনের পর শেষে তার মেজদির হাত ছাড়াইতে পারিয়া বড়দির সঙ্গে রীতিমত লড়াই সুরু করিয়া দিয়াছে।

"লক্ষী মাণিক, কথা শোন, কেমন সুন্দর জামা তোমার,"—দিদির অনুরোধ, অনুনয়েও ভাই তাহার কথা শোনে না।

খোকন পরাজয় মানিয়াছে। আমি উঠিয়া সশব্দে তুড়ি দিয়া তার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম। দুটি মিষ্টি চোখ আমার দিকে চাহিয়া মিটি মিটি করে।

আগন্তুক দেখিয়া ভয় পইয়াছে বুঝি ?

হাত বাড়াইলাম, ঘাড় ফিরায়। গায়ে হাত দিলাম, দিদির কাঁধে মুখ লুকায়। ভয় পাইবারই কথা। আমি যে অপরিচিত। চঞ্চল চোখ দুটি আমার দিকে ক্ষণকালের জন্য পাতিয়া ধরিতেও ভরসা পায় না।

"যাও খোকন, বাবার কাছে যাও,—ওকি! কথা শোন লক্ষ্মীটী!" সে কি কথা বোঝে যে দিদির অনুরোধে বাবার কোলে যাইবে!

এবার ঝাঁপাইয়া গেল পুটির কোলে। ছ-বছরের দিদির কোলেও সে যায়, তবু পিতার কাছে ঘেঁষিতে চায় না।

"বাবা, খোকন হাঁটতে শিখেছে,—এই দেখ" বলিয়া মিনি ভাইয়ের বিদ্যার পরিচয় দিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

দু-পা আগাইয়াই শিশুর মেজাজ গেল বিগড়াইয়া।

"হাঁটি হাঁটি পা পা,—হাঁটি হাঁটি পা পা, এই দুষ্টু ছেলে, কথা শোনো। হাঁটো দিকি নি।" বলিয়া মিনি যেই জোর করিয়া তাকে উঠাইতে যায়, দুষ্টু ছেলে অমনি কাঁদিয়া ফাটিয়া পড়ে। সুযোগ বুঝিয়া হাত বাড়াইলাম। সে ছোট্ট হাত দুটি দিয়া ওই মিনিকেই শক্ত করিয়া জড়াইয়া ধরিল, তবু আমায় সে আমল দিবে না।

পুঁটি তার রঙীন ডুরে শাড়িখানি পড়িয়াছে। বাঃ, বেশ মানাইয়াছে ত। আবার তার মায়ের চাবি-ছড়াও আঁচলে বাঁধিয়াছে, মেয়ে খুব গিন্নী হইয়াছে!

মিনিকে কহিলাম, "মা, ভায়লা শাড়ি আনি নি বলে দুঃখ করিস নি। এবার ক'লকাতা গিয়েই কিনে দেব।"

মিনি প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "কেন বাবা, এই ত বেশ কাপড়,

সুন্দর পাড়। পোষাকী কাপড় কি আর সব সময় পরা যায়—আর দু-দিনেই ত ছিড়ে যাবে।"

বুঝিলাম, মেয়ে আমার সেয়ানা হইয়াছে। খুশী।—হ্যাঁ, খুশী হইলাম বই কি।

মিনি খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "আমার শাড়ি চাই নে বাবা, খোকনকে ওবাড়ির ন'বৌদির ছেলের মত একটা নিকারবকার কিনে দিয়ো—কলকাতা গিয়ে, কেমন?"

নীরবে বাহির হইয়া গেলাম।

গৃহিণী গোবরজলে পিড়া লেপিতেছেন। আজ সপ্তমী পূজা। ঘরদোর উঠান-হেঁসেল সবই তক্ তক্ করে।

হাত মুখ ধুইতে গেলাম পুকুরঘাটে। তালগাছের গুড়ির গোটা-আষ্টেক সিড়ি।

ওপারে চক্রবর্ত্তীদের রান্নাঘরের পিছনের গাছটার ঝাকে ঝাকে স্থলপদ্ম ফুটিয়া আছে। পুকুরের জলে অনেকগুলি শাপলা। ঘাটের উপর ঝরিয়া পড়িতেছে শিউলি। নীল আকাশে নিরুদ্দেশ-যাত্রায় বাহির হইয়াছে শাদা মেঘের ছোট-বড়-মাঝারি ডিঙ্গিগুলি ছিটান পেঁজা তুলার মত দেখিতে। আজ ভুবন-ছাওয়া সোনালি আলোয় ঝুরঝুর করিয়া ঝরিয়া পড়ে নূতন গীতি, তাপের সুর, রেখার রিনিঝিনি। এই স্থল-জল-আকাশ-আলোর আশৈশব আবেষ্টন হইতে আমি চাহিতেছি মিনিদের কলিকাতা লইয়া যাইতে,—বেলেঘাটার স্যাৎসেতে এক গাছতলা কোঠায়!—

ঐ যে মুখুজ্যেবাড়ী ঢাক বাজিয়া উঠিয়াছে। গ্রাম দত্তবাড়ীর

সানাইয়ের আওয়াজ এখান থেকেও শোনা যায়। পলাশপুরের বারোয়ারি পূজার বাজনা যদু কামারের বাড়ী ছাড়াইলেই স্পষ্ট শোনা যাইবে।

আজ পূজা! সারা বাংলায়, গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে। পূজা! আজিকার দিনেও যে মানুষ দুটি দিনের জন্য সকল দুঃখ ভুলিতে শিখিল না, আর বাঁচিয়া থাকাটাই মহা অপরাধ।

সরযু দাওয়া লেপিতেছিল। ছেলেমেয়েদের কথা জিজ্ঞাসা করায় জানাইল, "ঠানপিসীমা ওদের ঠাকুর দেখাতে পূজোবাড়ি নিয়ে গেছে।"

"কই মিনি ত যায় নি। ঐ যে তুলসীতলা লেপছে।"

"ও যাবে-না।"

"কেন?"

সরযু চুপ করিয়া রহিল।

কহিলাম, "ওকে কেন কাজে আটকে রাখলে আজ? ছেলেমানুষ, আজ বছরকার দিনে—"

"আমি মেয়েকে তোমার আট্‌কে রাখিনি গো।"

"তবে ও যায়নি যে?"

এবার সরযু গলা খাটো করিয়া কহিল, "মেয়েকে কি বলেছ তা তুমিই জান। মাসেক ধরে মেয়ে তোমার খেঁদা, অপি, আমাদের কাছে ভায়লা শাড়ির গল্প করেছে। পূজোবাড়ীতেওদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে সে-ভয়ে মেয়ে এখন যেতে চাইছে না।"

চুপ করিয়া রহিলাম। বলিবার কি-ই বা আছে আর!

গৃহিণী কিন্তু বলিয়া চলিল, "মেয়ে তোমার অবুঝ নয় তাই বলে,

বড় হয়েছে, এখন ও বোঝে সবই। তবে কি-না, কাল বিকেলেও গোঁদীর কাছে—"

মিনি আসিয়া পড়িয়াছে। গৃহিণী এবার গলা চড়াইয়া দিল, "আমার সঙ্গে দুপুর বেলা প্রতিমা দেখতে যাবে'খন। মেয়ে যেতে চাইলেই ছেড়ে দেব কিনা! ডাগর হয়েছে, এখন যার-তার সঙ্গে যখন-তখন ছেড়ে দিলে লোকেই বা কি বলবে।"

মায়ে ঝিয়ে চোখে চোখে কথা হইল চমৎকার! অভিনয়টুকু জমিল বেশ! খুশী হইলাম। মেয়ের আমার বুদ্ধি হইয়াছে! এগার বছরেই পিতার কাছে চিরকালের জন্য তার আব্দার করা শেষ হইয়া গেল! এখনই অবাঞ্ছিত জানার ভার! গরিবের ঘরে অকালবোধন!

আমার উমার বুদ্ধি আছে!

নীল আকাশটা ঝাপসা দেখায় না? আর দক্ষিণ দিকের ঐ বকুল গাছটা? মেঘ করিয়াছে না-কি?

...ও কিছু না। দেখার ভুল।

গঙ্গাজল

সুলতা যে শেষকালে সুলেখার সঙ্গে 'গঙ্গাজল' পাতাইয়া বসিবে এ-কথা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই।

বিচিত্রই বটে! এত রেষারেষি, এত নিন্দাবিদ্রূপের পরিণতি কি না শেষে সখিত্ববন্ধনে, ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া! স্ত্রী চরিত্র দুর্জ্ঞেয় সন্দেহ নাই!

নূতন বাসায় উঠিয়া সেদিন রাত্রেই শুইবার সময় সুলতা স্বামীকে কহিল, "ওদের বৌটার বড় দেমাক।"

নরেন শুনিয়া মনে মনে হাসিল। সাত বছর একসঙ্গে ঘরকন্না করিয়া স্ত্রীর নাড়ীনক্ষত্র জানিবার ত আর বাকী নাই কিছু!

"—কলে জল ধরতে গেছি, বলে,—আমাদের আগে হোক, বাবুর আপিসের ভাত চাপাতে হবে। আপিসে যেন শুধু ওদের বাবুই যান্; আর আমাদের বাবু খেয়ে দেয়ে বাড়ী বসে ঘুমোয়! গুমর ছাখ না!"

নরেন কহিল, "তাতে হয়েছে কি এমন!—দুমিনিট বাদেই না হয় জল আনলে। আলাদা বাসা ভাড়া করে একা থাকবার যাদের ক্ষমতা নেই, একটু বুঝে-সুঝে মিলেমিশে না থাকলে কি তাদের চলে!"

সুলতা অমনি ফোঁস্ করিয়া ওঠে, "তুমি ত চিরদিন আমারি দোষ

দেখলে। মিলে-মিশে বুঝি আম্‌রাই থাকব, আর ওরা রাতদিন হুকুম চালাবে! না বাবা, অমন হ'লে থাকা চল্‌বে না এ-বাসায়।"

"একটু মানিয়ে চল্‌তে শেখ ত। এ নিয়ে চার বার বাসা বদলান হ'ল।—খরচের কথাটা নাই বা তুল্‌লাম,—এক-একবার যে হাঙ্গামা পোয়াতে হয়, সেই কি কম!"

"আমার দোষেই বুঝি বাড়ীর পর বাড়ী বদ্‌লেছ?"

"কেবল তোমার দোষ এ কথা ত বল্‌ছি নে,—তোমাদের মেয়েদের কথাই বল্‌ছি। একটু ধৈর্য্য ধরে বুঝে সুঝে মানিয়ে চলতে যেন তোমাদের কষ্ট হয়।"

সুলতা ঝাঁজিয়া উঠিল, "হয়েছে গো—থামো।—আর শাক দিয়ে মাছ ঢাক্‌তে হবে না। কুঁদুলে মাগীকে বিয়ে করেছিলে কেন?—দেখে-শুনে আর একটা ভালমানুষ ঘরে আনলেই ত হয়।"

নরেন এবার রাগিয়া যায়, "চেঁচিয়ো না, ঝগড়া করার স্বভাব তোমার মরলেও যাবে না। আজ প্রথমদিনই নতুন জায়গায় অপরিচিত লোকগুলোর কাছে তোমার গলার পরিচয়টা নাই বা দিলে।"

ভীমরুলের চাকে পড়িল ঢিল! —মিনিটে দেড়-শ কথার স্পীড্‌। কাঁদিয়া-কাটিয়া আচ্ছা কাণ্ড বাধাইয়া অবশেষে স্বামীকে জানাইয়া রাখিল কাল সকালেই সে যে-দিকে দু'চোখ যায় চলিয়া যাইবে, না হয় কালীঘাটে ভিক্ষা করিয়া খাইবে,—এমন সংসারে তাহার কাজ নাই!

এমন ঘটনা তাহাদের গা সওয়া হইয়া গিয়াছে। তবে আজ নূতন জায়গা.—এই যা!

পরদিন সকালে আবার যে কে সেই। স্বামীর আপিসের ভাত

রাঁধিল, খাইল দাইল, বাসন মাজিল, বিকেলে উনুনে আঁচ দিয়া স্বামীব জলখাবারের পরটা করিয়া রাখিতেও ভুলিল না।

রাত্রে সুলতা আজ আবার ওদের বৌএর কোষ্ঠী কাটিতে বসিল। সে যে দেমাকী এ-কথা সে প্রমাণ না করিয়াই ছাড়িবে না; কহিল, "শুন্‌ছ কি রকম চেঁচিয়ে হাস্‌ছে—লজ্জাও নেই। আশে পাশের লোক-গুলির কথা না হয় ছেড়ে দিই,—এ ঘরে আমরাও ত দুটো লোক আছি।"

বাড়ী মাতাইয়া স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া করার চেয়ে স্বামী-স্ত্রীতে গলা ছাড়িয়া হাসাহাসি করাটা বেশী অপরাধ কিনা, নরেন্দ্রনাথ চুপ করিয়া বসিয়া তাহাই ভাবিতে থাকে। অথচ কোন জবাব না দিলেও বিপদের সম্ভাবনা আছে যথেষ্ট। মাঝে মাঝে দু'চারটী সংক্ষিপ্ত 'হুঁ্যা, হুঁ' 'আচ্ছা' বলিয়া স্ত্রীর কথার ধারাটা বজায় রাখে।

দোতলা বাড়ী। উপরের সবটা জুড়িয়া বাড়ীওয়ালার নিজের সংসার। নীচের একটী অংশ সম্পূর্ণ আলাদা,—এক হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক সপরিবারে থাকেন। অপর অংশে তিনখানি ঘর। দু'খানি শোবার ঘর,—একটু দূরেই অবস্থিত। দুটী পরিবার থাকে। কল, চৌবাচ্চা, পায়খানা সবই এজমালী। অবশ্য রান্নাঘর আলাদা।

নরেন ৫০৲ টাকা মাহিনায় সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে কাজ করে। ধীরেশ এক ইনসিয়োরেন্স্‌ কোম্পানীতে ৪৫৲ টাকার কেরাণী। আলাদা বাসা ভাড়া করিয়া থাকিবার ক্ষমতা নাই কারুরই।

বাইরের দিকের ছোট ঘরটা দুই পরিবারের ব্যাটাছেলেরা ব্যবহার করে। সম্পূর্ণ অংশের ভাড়া মাস টাকা ত্রিশ, দুই পরিবার ভাগাভাগি করিয়া দেয়।

দুয়ার খোলা থাকিলে এ-ঘরের একটু-জোরে কথা ও-ঘরে স্পষ্ট শোনা যায় যদিও দু-ঘরের দুয়ারেই দু'টি পরদা আছে। টুক্‌রো টাক্‌রা কথাবার্ত্তার মধ্যে, উভয় সংসারের জীবনযাত্রার অনেকখানি, পরিচয় উভয় পক্ষই পায়।

সেদিন রাত্রে দুয়ার বন্ধ করিয়া সুলতা স্বামীকে প্রশ্ন করিল, "হ্যাঁগা! ব্যাঙ্কের কাজই বড়, না বীমা কোম্পানীর চাকুরী বড়?"

"এ কথার মানে?"

"আগে বলোই না।"

নরেন হাসিয়া কহিল, "কোনটাই ছোট নয়।"

সুলতা ক্ষুন্ন হইয়া কহিল, "তুমি বাঙালকে হাই কোর্ট দেখাচ্ছ, না? সব কাজ বুঝি সমান হয়! সরকারী চাকুরী আর সওদাগরী আপিসের কাজ বুঝি এক-ই?"

নরেন ব্যাপারটা আন্দাজে কতক বুঝিয়াছে; কহিল, "দুই-ই সমান।"

"তুমি কিচ্ছু জান না। ব্যাঙ্কের সঙ্গে নাকি বীমা কোম্পানীর তুলনা! ভারী ত কাজ!"

নরেন হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপারখানা কী? ধীরেশবাবুর বৌ এর সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক হয়েছে বুঝি?"

সুলতা হাত নাড়িয়া বলিল, "ছুঁড়ী যেন অহঙ্কারে মরে যায়। আচ্ছা, ধীরেশবাবু কত টাকা মাইনে পান্‌?"

"কি করে জানব! জিজ্ঞেস করাটা ভাল দেখায় না। তবে মনে হয় গোটা চল্লিশ পয়তাল্লিশ টাকা পান।"

সুলতা উৎফুল্ল হইয়া ওঠে, "অথচ দেমাকী মাগী বলে কিনা ওর স্বামী ৮০ টাকা মাইনে পায়। বলে, ওর বাবুর পদ নাকি বড়সাহেবের

পরেই। সাহেব তাকে ডেকে একসঙ্গে চা খায়। আরো কত কী যে বলেছে—হেসে মরে যাই। ১০০ টাকার চাকুরে এসেছেন ১৫ টাকার ভাড়াটে বাসায় !”

নরেন হাসিয়া কহিল, “তুমিও যে বড় ছেড়ে দিয়েছ তা তো মনে হচ্ছে না। তোমার বাবুর কত টাকা বলেছ গো ?”

“কেন, আমিও বা ছেড়ে দেব কেন ! ও বাড়িয়ে বলবে, আর চুপ করে সহ্য করে যাব, না ?”

নরেন হাসিতে হাসিতে কহিল, “হ্যাঁ, এই ত চাই। যোগ্য স্ত্রী। কত টাকা বলেছ সেইটেই ত জিজ্ঞেস করছি।”

সুলতা স্বামীর হাত দুটী ধরিয়া কহিল, “আমার মাথা খাও—ধীরেশবাবুকে বলো না যেন, তুমি ৫০ টাকা মাইনে পাও। আমার মুখ খাটো করো না।”

“সে ত বুঝলুম। কত বলেছ সেটা জানা না থাকলে হঠাৎ একদিন জিজ্ঞেস করে বসলে আমি কী উত্তর দেব তখন ?”

সুলতা একটু থামিয়া সামান্য ইতস্ততঃ করিয়া ফিক করিয়া হাসিয়া কহিল, “এক শ পঁচিশ।

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল নরেন “এ—ক—শ পঁচিশ ! আমায় একদিনেই রাজা করে দিলে যে।”

সুলতা তাহার শাসন-সুন্দর চোখ দুটী কুঞ্চিত করিয়া কহিল, “আঃ আস্তে কথা বলো না। ও-ঘর থেকে শুনতে পাবে যে।”

“শুনুক ! ভয় কি এমন !” বলিয়া সুলতা অনুচ্চ কণ্ঠে বলিয়া চলিল, “ওঁর বাবা নাকি মস্ত জমিদার। আশে-পাশে একশ গাঁয়ের মধ্যে

অমন নামডাক না কি কারু নেই। ওর দাদা নাকি কী একটা পাশ দিয়ে বসে আছে,—৩০০৲ টাকার কমে চাকুরী করবে না। বলে, খাবার ভাবনা ত আর নেই। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ নাকি বারবার চিঠি দিয়েছে, তবু দেখা করে না।"

"এ ত গেল্ ও-দিককার কথা। এ-পক্ষ কী বলেছে শুনতে পাই কি?"

সুলতা চুপ করিয়া হাসিতে লাগিল। সে ও যে সবিস্তারে পিত্রালয়ের মুখোজ্জ্বল করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই, তাহা বুঝিতে নরেনের বিলম্ব হয় না। সহাস্যে কহিল, "ও-পক্ষ যখন জমিদার, এ-পক্ষ রাজা উজির, কি, লাট্ বেলাট্, একটা কিছু হবে ত নিশ্চয়ই।"

সুলতা হঠাৎ রাগিয়া ওঠে, "ছাখ, আমার বাপ-মা গরিব বলে তাদের তুমি অপমান করতে পার না।"

নরেন ভয় পাইয়া কহিল, "তোমায় কোন কথা বললেই বিপদ, গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে আস! তোমার বাপ-মা গরিব বলে কোনদিন কোন কথা আমার মুখে শুনেছ? আমিই বা কোন্ আগরলাল বংশীলাল ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা।"

ধীরেশদের ঘরে তখন স্বামী-স্ত্রীর কথা-কাটাকাটি সপ্তমে চড়িয়াছে। এ ঘরের দুয়ার বন্ধ বলিয়া স্পষ্ট করিয়া কিছু বোঝা যায় না। বোধ হয় এমনতর এক প্রসঙ্গেরই নরম গরম আলোচনা চলিয়াছে।

নরেন কহিল, "কিন্তু গিন্নিঠাকৃরুণ! আমাদের আপিসে যে ধীরেশ বাবুর এক পিস্‌তুতো ভাই কাজ করে। আমার মাইনের পরিমাণটা জানতে ওদের বেগ পেতে হবে না— হয়ত এদ্দিনে জেনেও থাকবে।"

"তুমি সে-কথা এদ্দিন বলোনি কেন!"—সুলতার কথার উত্তাপ সহসা 'বয়েলিং পয়েন্ট' থেকে 'ফ্রীজিং পয়েন্টে' নামিয়া আসে যেন। এ্যাঁ! শেষকালে তার অমন উঁচু মুখ নীচু হইবে নাকি! মহা দুশ্চিন্তায়, সুলতা দেবী হঠাৎ যেন কি এক রত্ন খুঁজিয়া পাইয়াছে এইরূপ ভাবেই বলিয়া উঠিল, "সেদিন না, তুমি কলতলায় নাইবার সময় ধীরেশ-বাবুকে বলছিলে, তোমাদের গাঁয়ের মুখুজ্যেদের কে একজন তাদের ওখানে কাজ করে,—ছোটবেলাকার বন্ধু তোমার, আজ বছরখানেক দেখা-সাক্ষাৎ নেই। তার কাছে যাওনা একবার।"

নরেন হাসিয়া কহিল, "তাঁর কাছে গিয়ে না হয় তোমাকে ধীরেশ-বাবুর মাইনের খাঁটি খবরটাই জানালেম। কিন্তু আমার ১২৫৲ টাকা! হা হতোঽস্মি!"

"কেন, তোমার কি ১২৫৲ রোজগার করার মুরদ নেই নাকি? একচোখো সাহেব ব্যাটাই ত দু'-দু'বার তোমার প্রমোসন্ দিলে না।"

"তা বটে।" বলিয়া নরেন হাসিতে থাকে।

দুচার দিনের মধ্যেই উভয় পক্ষ খাঁটি খবর পাইয়া নিশ্চিন্ত হইল। অথচ মজা এই, উভয়েই ভাবে অপর পক্ষ এ পক্ষের কিছুই জানে না।

এমনি করিয়া দুই সংসারের দুই গৃহলক্ষ্মী এ ওর খুঁত ধরিয়া, আড়ালে আবডালে নিন্দা করিয়া, পরস্পরের অভাব-অভিযোগে মজা দেখিয়া দিন কাটাইতে থাকে। কল লইয়া, চৌবাচ্চার নলটা লইয়া, মেথর আসিলে কে জল ঢালিবে, সিঁড়ির নীচেটায় কে কতখানি স্থান অধিকার করিবে প্রভৃতি তুচ্ছ ঘটনা লইয়া মাঝে মাঝে ছোট-খাটো দু'চারিটী খণ্ডপ্রলয়ও হয়।

পাশাপাশি বসবাস,—ছেলেপিলে নাই কোন ঘরেই, সময় কাটিতে চায় না। সুতরাং আবার কথাও চলে,—ঠেকিয়া কথা বলা গোছের। পরস্পরের প্রতি তেমনি বিরূপ হইয়া আছে তারা মনে মনে।

এত কাণ্ডের পর সেই সুলতা কিনা শেষে সুলেখার সঙ্গে পাতাইল 'গঙ্গাজল'! নারী, তবে সত্যসত্যই অঘটনঘটন-পটীয়সী!

ঘটনাটা এমন কি-ই বা!

হঠাৎ সেদিন সুলেখা কি ভাবিয়া সুলতার রান্নাঘরের দুয়ারে আসিয়া কহিল, "আচ্ছা দিদি, তুমিই বল না,—আজ এই ভর অমাবস্যার দিন চুল কাট্‌তে আছে। তা বলেছি বলে সমস্ত মেয়েজাত তুলে 'ফুল-ষ্টুল' কত কী-ই না বল্‌লে।"

সুলতা হাসিয়া ধীরেশবাবুকে শোনাইয়া কহিল, "কিছুতেই কাট্‌তে দিস্ নে বোন্। বাইরে ওঁরা যা খুসী করুক্‌গে, আমরা তা দেখতে যাই না। কিন্তু ঘরে এসে আমাদের কথা ওঁদের শুন্‌তেই হবে, তা ফুল-বেলপাতা মুখ্যুসুক্যু যা-ই হই না কেন।"

ধীরেশ ঘরের মধ্য হইতে হাসিয়া কহিল, "আপনার কাছে বানিয়ে বল্‌ছে। আমি মেয়েদের ও-সব বলি নি কিন্তু।"

সুলতা হাসিয়া কহিল সুলেখাকে, "তুমিও ত আচ্ছা যা হ'ক। পরামাণিককে যেতে বলে দাও না। আস্‌ছে রোববারে আসবে।"

ব্যপার দেখিয়া পরামাণিক বাক্স লইয়া প্রস্থান করে।

সুলেখা ঘরে ঢুকিতেই ধীরেশ হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা হাকিম পাকড়েছিলে।"

রন্নাঘর হইতে সুলতা জবাব দেয়, "বল না বোন, এখন থেকে

ওঁরা যেন ঘরে বসে থাকেন। বাইরে বেরুলে ওদের চেয়ে আমরা কম যাব না।"

নরেন এতক্ষণ সব কথাই শুনিতেছিল, দুয়ারের কাছে আসিয়া কহিল, "ও ধীরেশবাবু, চলুন বাজারে যাই, শাড়ী সেমিজ কিনতে হবে,— এখন থেকে পরতে হবে ত।"

সেদিন হইতে দুই গৃহলক্ষ্মীর মধ্যে কটুম্বিতার সূত্রপাত।

পরদিন বিকেলে সুলেখা আসিয়াছে সুলতার কাছে চুল বাঁধিতে। বয়সে সুলতা বছর দুয়েকের বড়ই হইবে। বিনুনি পাকাইতে পাকাইতে সুলতা কহিল, "তোমার আর আমার নাম প্রায় একই।"

সুলেখা বলে, "হ্যাঁ দিদি, 'সু' ত দুজনের নামেই আছে।"

"শুধু 'সু' কেন বোন, 'ল'ও ত রয়েছে।"

"তা হ'লে তুমি আমার সই দিদি।"

সুলতা খোঁপা তুলিতে তুলিতে কহিল, "কে জানে, আরেক জন্মে হয়ত আমার বোনই ছিলে।"

এবার সুলেখা বাঁধিতেছে সুলতার চুল। চিরুনী চালাইতে চালাইতে কহিল, "আচ্ছা দিদি, সেদিন নরেনবাবু তোমাকে আন্না বলে ডাকতেই তুমি তাঁকে ইসারায় থামিয়ে দিলে কেন? আন্না তোমার ডাক-নাম বুঝি?"

"হ্যাঁ বোন! কিন্তু কী অসভ্য ছাখ! ধীরেশবাবুর সামনে ও-নাম ধরে ডেকে আমায় লজ্জা দেবে, এই ছিল ওর ইচ্ছে।"

সুলেখা হাসিয়া কহিল, "তা বেশ ত! আন্না নামটা কি খারাপ?"

সুলতা দাঁতে-ধরা লাল ফিতাটা মুখ হইতে ছাড়িয়া দিয়া কহিল, "ছাই

নাম ! আন্না নাম রেখেছিল আমার ঠাকুরমা। বুড়ী আজ বেঁচে থাকলে রাতদিন তাঁর সঙ্গে আড়ি করতাম। পাঁচ মেয়ের পর আমি যখন হলাম, বাড়ীশুদ্ধ সবাই বল্‌লে,—আর না। সেই আর-না-ই 'আন্না' হয়ে গেছে।"

হাসিয়া সুলেখা কহিল, "আমারো যে ও রকম এক নাম আছে দিদি। চার মেয়ের পর মা বলল,—আর না, তবু আমি হলাম। তাই আমার নাম হ'ল 'তবু'। বাপের বাড়ী সবাই আমায় 'তবু' বলেই ডাকে।"

"তাই নাকি বোন! তবে তুমি আমার মিতিন! এদ্দিন এ-কথা বলো নি কেন?" বলিয়া সুলতা সুলেখার হাত দুটী টানিয়া কোলের উপর তুলিয়া নেয়।

পরদিন বাবুরা অফিসে চলিয়া গেলে আন্না ও তবু উপরের গিন্নিকে বলিয়া গঙ্গায় গেল তাহাদের ঝিকে লইয়া। আহিরীটোলার ঘাটে এক বুক জলে নামিয়া দুজনে কানে কানে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি সব আওড়াইয়া 'গঙ্গাজল' পাতাইয়া বাসায় ফিরিল বেলা দুটায়।

পরদিন হইতে সুরু হইল প্রগাঢ় কুটুম্বিতা।

সকালে উঠিয়া দুই সখা গল্প করিতে করিতে বাসন মাজে, জল তোলে, উনুনে আঁচ দেয়, অফিসের ভাত চাপায়।

দুপুরে মেঝেতে শুইয়া পরস্পরের সুখ-দুঃখের কথা শোনে। কবে সুলতার বাবা মেয়ের চিঠি না পাইয়া অস্থির হইয়া তার করিয়াছিল, স্বামী কবে রাগ করিয়া দু-দিন বাড়ী আসে নাই,—সুলেখার অসুখে ধীরেশ দুদিন অফিস কামাই করিয়া রাতদিন ঘরে বসিয়া কাটাইয়াছে,

দেওঘরে বেড়াইতে গিয়া সেবার স্বামী হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় সে কি রকম অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল,—এ-রকম ছোট-খাটো, সত্য, অর্দ্ধ-সত্য, বানানো, বাড়ানো, নানা কথার অশ্রান্ত বিনিময় চলে, দুই সখীর।

বিকেলে একসঙ্গে গা ধোয়, এ ওর চুল বাঁধিয়া দেয়, সিঁদুর পরায়, আলতা দেয় পায়। ময়দা মাখিতে মাখিতে সমালোচনা চলে উপরের গৃহিণীর অহঙ্কারের, কিংবা, পাশের অংশের হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকটীর বেয়াড়া রকমের দৈহিক স্থূলতার, অথবা ও বাসার সেজ বউএর অসহ্য বেহায়াপনার বা ঐ জাতীয় কোন না কোন মুখরোচক প্রসঙ্গের।

এক এক দিন দুই বন্ধু বাবুদের সঙ্গে বেড়াইতেও যায়। কাপড় জামা কিনিতে হইলে দুই সখী একসঙ্গে বাহির হয়। সুলেখার কাপড়ের পাড় পছন্দ করিয়া দেয় সুলতা, গঙ্গাজলকে কোন্ রঙের কাপড়ে মানাইবে ভাল ঠিক করিয়া দেয় সুলেখা।

সিনেমায় গিয়া দুই সখী বসে পাশাপাশি। বিয়োগান্ত বাংলা বইয়ের শেষের দিকে ট্র্যাজিডি যখন চূড়ান্ত হইয়া উঠিয়াছে, সুলতা ও সুলেখার চাপা কান্না শুনিয়া ধীরেশ ও নরেন পরস্পরের গা টিপিয়া হাসে! হঠাৎ প্লে শেষ হয়, আলো জ্বলে,—একজন এইমাত্র চোখ-মোছা শেষ করিয়াছে, আর একজন আঁচলে নাক ঝাড়িয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতেছে। "দুজনে কেঁদে যে গঙ্গাযমুনা বইয়ে দিলেন,"—বন্ধুদের একজন হয় ত হাসিয়া বলে।

দুই সখী চোখ-চাওয়াচাওয়ি করিয়া মুচ্‌কি হাসে।

আরো আছে—

এ-ঘরে কোন বিশেষ খাদ্য-দ্রব্য আসিলে ও-ঘরেও তাহার অর্দ্ধেক ভাগ যায়। সুলেখার রান্নাঘর হইতে ইঁচোড়ের ডালনা রাঁধার গন্ধ পাইয়া সুলতা হাসিয়া বলে, "একা একা খেলে অসুখ করবে মিতিন।" সুলতার ঘরে ইলিশ মাছের কাঁটা দিয়া পুঁই চচ্চড়ি হইলে সুলেখা আসিয়া বাটী পাতিয়া ধরে, "ওঁর খাওয়া হয়ে গেছে—তবু ছাখ না বসে আছে. না খেয়ে উঠবে না গো।"

সুলেখা যেদিন জ্বর হইয়া রাঁধিতে পারে না, ধীরেশ এ-ঘরে খাইয়া আফিসে যায়। গঙ্গাজলের বালি জ্বাল দিয়া সুলতা জোর করিয়া তাহাকে পথ্য করাইয়া নিজে আসিয়া খাইতে বসে।

স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া করিয়া সুলতা হয় তো গোসা করিয়া শুইয়া আছে সকাল থেকে। উনুনে আজ আগুন পড়ে নাই।—ধীরেশ নরেনকে জোর করিয়া টানিয়া নিয়া একসঙ্গে খাইয়া-দাইয়া আফিসে যায়। গঙ্গাজলের সাধাসাধিতে সুলতারও রাগ পড়ে, দুই সখী তারপর ঘণ্টাখানেক ধরিয়া কত কি গল্প করিতে করিতে বেশী ভাত খাইয়া ফেলে।

দুই সখী আবার সম দুঃখীও বটে। দুই-জনেরই বিবাহ হইয়াছে প্রায় এক যুগ হইতে চলিল, কিন্তু আজও সন্তান সৌভাগ্য ঘটে নাই কাহারো। স্বামীর কাছে যে-ব্যর্থতার কথা ভাল করিয়া খুলিয়া বলিতে আজও লজ্জা পায় দুই সখী পরস্পর তাহাই আলোচনা করিয়া সান্ত্বনা খোঁজে। সেদিন দুইজনেই উপরের গিন্নিমার সাথী হইয়া দমদমায় কোন্ এক সাধুর কাছে ঘুরিয়া আসিয়াছে। সাধু কি বলিয়াছে সে খবর কেহ রাখে না। দুই সখী মঙ্গলবার অতি ভোরে উঠিয়া কাপড় ছাড়িয়া কি এক পদার্থ গলাধঃকরণ করিয়াছে অতি ভক্তিভরে।

হাস্য কৌতুকও চলে অনেক সময় বেশ একটু মাত্রা লঙ্ঘন করিয়াই। সেদিন মাছ মাংসে অনাসক্ত ধীরেশ স্ত্রীকে শাক-সবজির উপকারিতা বুঝাইতেছিল। নরেন ডাকিয়া কহিল, "ও ধীরেশবাবু, আপনার ওই ভিটামিন তত্ত্বে স্ত্রীর রুচি ফিরিয়ে দেবেন না। যে যা বাসে সে তা রাঁধেও ভাল। আমার গৃহলক্ষ্মীটীও যে আপনারই মতো অর্দ্ধ নিরামিষপন্থী। মাঝে মাঝে মুখটা বদলাই, তাতে আর বাদ সাধবেন না।"

সুলতা কহিল, "বলো না আর! শাক-ডাঁটা বাজার থেকে পারত পক্ষে আনতে চাইবে না। নিজে যা ভালবাসে, তাই নিয়ে এসে হাজির করবে।"

ধীরেশ হাসিয়া কহিল, "রোজ আমাদের দুই ঘরে খাবারের একচেঞ্জ হলে মন্দ হয় না।"

নরেন হাসিয়া উঠিল, "কেন, একেবারে বদ্‌লা-বদলি করে নিলেই ত হয়।"

"বেশ ত" বলিয়া ধীরেশও তাহার স্ত্রীর দিকে চাহিয়া হাসে।

দুই সখীর মুখ হইতে এক সঙ্গেই বাহির হইয়া আসে "অসভ্য!" সুলতা ও সুলেখা রাগিয়া যার যার রান্নাঘরে ঢোকে। দুই বন্ধুও হাসিতে হাসিতে যার যার ঘরে যায় ফিরিয়া।

এরূপ লঘু তরল হাস্য-পরিহাসে দিনের পর দিনগুলি কাটিতেছিল বেশ। আশে পাশের আর উপরের লোকগুলির কিন্তু কান-ঝালাপালা! —রাত্রদিন চব্বিশ-ঘণ্টা উঠিতে বসিতে কেবলি. "ও ভাই গঙ্গাজল' 'যাই গঙ্গাজল', 'শোন মিতিন,' হ্যাঁ গো সু!"

সবার সাথে

উপরের বাড়ীওয়ালার আট বছরের দুষ্টু ছেলেটা মাঝে মাঝে অসহিষ্ণু হইয়া নাকী-সুরে কথা নকল করিয়া ডাকে, "ও গঙ্গাজল!" গৃহিণী ছেলেকে শাসায়। নীচে সুলেখা বলে, "কি বদ্‌মাস্‌ ছেলে গো!" সুলতা হাসে, "বলুলেই বা,—ছেলেমানুষ বৈ ত নয়।"

এমনি করিয়াই পাশাপাশি দুটা সংসার মিলিয়া-মিশিয়া আনন্দে দিন কাটায়। হঠাৎ এক ঝড়ো মেঘ আসিয়া যেন সব ওলট পালট করিয়া দিল। দুই সখীর মধ্যে অনেকদিন ধরিয়াই বোধ করি মন ভাঙ্গাভাঙ্গির কোন এক কারণ ধীরে ধীরে গজাইয়া উঠিতেছিল, নইলে সেদিন ঐ তুচ্ছ চৌবাচ্চার মগটা লইয়া এতবড় এক প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়া যাওয়া সম্ভব নহে।

ঝগড়ার মুখে সুলতা জানাইয়া দিল—মিথ্যাবাদী দজ্জাল মাগীর বাপ জমিদার না তাত! ত্রিশ টাকার কেরাণীর মাগের এত আস্পর্দ্ধা! ভাই যেন ম্যাজিষ্ট্রেটের পেস্কার আর কি!

সুলেখাও গর্জ্জাইল—ক্ষুদকুড়োনীর বেটীর আবার এত বড় গলা! লাট্‌সাহেবের ঘরণী আসিয়াছেন! —কুঁদুলে মাগীর সাথে [illegible]!

আরো নানা কথা নানা ভাবে নানা ঢঙে—হাত নাড়িয়া, মুখ নাড়িয়া, চোক বাঁকাইয়া—অনর্গল, অফুরন্ত, ঘণ্টা খানেক ধরিয়া।

পাশের বাড়ীর মেয়েরা জানালায় ভীড় জমাইয়া মজা দেখিল। হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকটী এ দিকের দুয়ার একটু ফাঁক করিয়া সুলতা ও সুলেখার কলহের ভাষা বুঝিতে না পারিয়া নিরাশ হইয়া শুধু হাসিতে লাগিল।

অবশেষে এ ওকে ভাতারখাকী, পোড়ারমুখী, ও তাকে বাপখাকী,

ছোট লোকের মেয়ে, বলিয়া আপ্যায়ন করিতে করিতে চুলোচুলি বিবাদ ক্ষান্ত করে। তারপর যে যার ঘরে দুয়ারে বন্ধ করিয়া বাবুদের আফিস প্রত্যাগমনের অপেক্ষায় নিস্ফল রোষে গজগজ্ করিতে থাকে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গৃহকর্ত্তারা বাসায় ফিরিলেন। দুই ঘরেই দুয়ার বন্ধ হইল সঙ্গে সঙ্গে।

ওঘরে সুলেখা স্বামীকে শাসাইল, "তুমি যদি আর ওদের সংশ্রবে থাকো, আমি কালই আফিম্ খেয়ে মরব, নয় ত কাপড়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেব।"

এঘরে সুলতা টগ্‌বগ্ করিল, "ওদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রেখেছ ত আমি গঙ্গায় ডুবে মরব।"

দুই বন্ধু ত অবাক্! রাত্রিতে ভয়ে ভয়ে কেহই ডাকিয়া কথা কহিল না, পরদিন রাজারে যাইবার পথে দোতরফা ঘটনা শুনিয়া উভয়ে হাসিয়া সিদ্ধান্ত করিল,—এ এমন কিছু নয়, দুদিন বাদে আপনি মিটিয়া যাইবে।

দুদিন কেন, দুমাসেও কিন্তু মিটিল না। গঙ্গাজল সেই যে জমাট বাধিয়াছে, আর যেন গলিতে চায় না।

এক কলে জল তোলে, এক চৌবাচ্চায় স্নান করে, কাজকর্ম্মে এঘর ওঘর করিতে দিনে অমন একশ বার দেখা হয়, তবু কেহ কাহারও মুখের দিকে ভাল করিয়া তাকায় না আর।

ধীরেশ ও নরেন বিস্তর চেষ্টা করিয়া নিরাশ হইয়াছে। একজন রুষিয়া বলে, "কী! যে আমায় ভাতারখাকী বলেছে তার সঙ্গে বলব কথা!—এ জন্মেও নয়।" আর একজন ফুঁসিয়া ওঠে "পীরিত করতে

হয় তুমি কর। ওই পোড়ারমুখীর আমি দেখব মুখ! বলে কিনা আমার চোদ্দ পুরুষ ছোটলোক! হারামজাদী!"

আরো একমাস চলিয়া গেল। নরেন ও ধীরেশ এখন বাড়ীতেই কথাবার্ত্তা বলে। সেদিকে কড়া আপত্তি শিথিল হইয়াছে। কিন্তু গঙ্গার বুকে এক মস্ত-বড় চড়া পড়িয়া এদিকের জল রাশির সঙ্গে ওদিকের সম্বন্ধ যেন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

ধীরেশ ও নরেন আজ এক-সঙ্গে বাজার সারিয়া বাসায় ফিরিয়াছে। ঘরে ঢুকিয়া নরেন স্ত্রীকে কহিল, "ওগো শুনছ, একটা সুখবর আছে!"

"কিসের সুখবর?"

"কী খাওয়াবে আগে বল, তা না হ'লে সুসংবাদটা বলছি নে" বলিয়া নরেন হাসিতে থাকে।

"আঃ বল না," বলিয়া সুলতা উৎসুখ চোখ দুটী নিবদ্ধ রাখে স্বামীর মুখের উপর সুসংবাদেব আশায়।

"তোমার গঙ্গাজলের ছেলে হবে, আজ এই মাত্র ধীরেশবাবু বলুল।"

সুলতা চুপ করিয়া রান্নাঘরে চলিয়া যায়।

খাইয়া-দাইয়া নরেন অফিসে চলিয়াছে। ডাকিয়া কহিল, "পান দিলে না সুলু।"

রান্নাঘর হইতে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। নরেন বারকয়েক ডাকিয়া উত্তর না পাইয়া এবার একটু উষ্ণ হইয়া কহিল, "তোমার আজ হয়েছে কী? ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না। পান দেবে না আজ?"

এবারে জবাব আসিল, "চোখের মাথা খেয়েছ ? চৌকির উপর পান রয়েছে দেখতে পাও না ?"

নরেন পান চিবাইতে চিবাইতে রান্নাঘরের দুয়ারে আসিয়া দেখে স্ত্রী চুপ করিয়া গালে হাত রাখিয়া বসিয়া আছে। সুলেখাদের দুয়ার বন্ধ; পীরেশ চলিয়া গিয়াছে।

নরেন আবার কহিল, "তোমার আজ হয়েছে কী বলো তো ? বারবার কথা বল্‌লেও জবাব মেলে না !"

সুলতা জবাব দিল বটে, কিন্তু কথায় তার খানিক আগেকার সেই উত্তাপটুকু আর নাই।

"আপিসে বেরুচ্ছ যাও না ! আমার এখানে এসেছ কেন ? বাঁজা মেয়েমানুষের মুখ দেখে বেরুবে, পথে মোটর-চাপা পড়বে'খন।"

"তোমার আজ হ'ল কী ?"

"হবে আবার কী ! অন্যায় কিছু বলিনি তো। আঁটকুড়ীর মুখ দেখে শুভকার্য্যে যেতে নেই,—এতেই দোষ হ'ল ?"

নরেন বুঝিল এখন কথা বলিতে গেলে ঐ মেঘভার মুখে শুধু বিদ্যুৎই চমকাইবে।

নরেন চলিয়া গেল। সুলতা উঠিয়া স্বামীর পাতে খাইতে বসিল। ভাল লাগে না কিছু। অর্দ্ধেক ভাত ফেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া গিয়া মুখ ধুইয়া আসিল।

বিছানায় শুইয়া কেবলি এপাশ ওপাশ করে। ঘুম আসে না যে ! ভাবী সুসংবাদ ! স্বামীর অমন করিয়া খবরটা আজই প্রচার না করিলে যেন রাত্রে আর ঘুম হইত না !…

তাই না পোড়ারমুখী বারেবারে বমি করিয়া মাথা ঘুরায় বলিয়া শুইয়া থাকে! তাই না সেদিন কলতলায় চাল ধুইতে গিয়া একমুঠো মুখে পুরিয়া দিব্বি মুট্‌ মুট্‌ করিয়া চিবাইয়া খাইল!······

ব্যাটা হতচ্ছাড়া দমদমের সাধু,— ও না কি আবার কিছু জানে!

দিন পনের আগে সুলতা একটা বিড়ালের বাচ্চা আনাইয়াছে পোষ মানাইবে বলিয়া। বিড়ালের আদর-যত্ন দেখিয়া তার স্বামীরও হিংসা হইবার কথা।

কিন্তু মাসেক না পার হইতেই বিড়ালের বাচ্চা স্বরূপ প্রকাশ করে। স্বাদ-দুগ্ধ আর মাছ খাইয়া সুলতাকে জ্বালাতন করিয়া তোলে। সুলতা আদর করিয়া কোলে তুলিয়া নিয়া সেদিন [illegible] করিয়া ঘুম খাইতেই বসিয়াছিল, বেরসিক মার্জ্জার শাবক তাহার [illegible] মর্য্যাদা রাখিল না, আঁচড়াইয়া তাহার নাকের পাশে ঠিক চোখের [illegible] রক্ত প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছে। রাগিয়া সুলতা বিড়ালের বাচ্চাটাকে বিদায় করিয়া দিল।

কিছুদিন পরে চৈত্র-সংক্রান্তির দিন বৌবাজারের মেলা হইতে স্বামীর সঙ্গে গিয়া একটা টিয়া পাখী কিনিয়া আনিল। পাখীটি ছাতু ছোলা খায়, আর রাতদিন শুধু ঝিমায়। কখনো বা কিচ্ কিচ্ শব্দ করিয়া বাড়ী মাতাইয়া তোলে। সুলতা তাহাকে কথা শিখাইতে কত চেষ্টাই না করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। "বল রাধা-কৃষ্ণ,

"সীতা-রাম", "খোকার মা গো",—বারে বারে কত সাধ্যসাধনা, পাখীর বাচ্চা কথা শোনে না! রাগিয়া সুলতা সেদিন খাঁচার মুখ খুলিয়া দিল।

সুলতা এবার অপদার্থ পশুপক্ষী ছাড়িয়া পরমার্থ-চিন্তায় মনোনিবেশ করিল। ঘরের এক কোণে একটী লক্ষ্মীর আসন, স্থাপন করিল ছোট একখানি জলচৌকি পাতিয়া। চারিদিকে দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলন, শিশু ক্রোড়ে যশোদা মূর্ত্তি প্রভৃতি নানারকম দেব-দেবীর ছবিতে ঘর উঠিল ভরিয়া।

প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় ঘণ্টা তিনেক তপ-জপেই কাটায়। প্রতি বৃহস্পতিবারে সারাদিন না খাইয়া উপবাস করিয়া থাকে। সন্ধ্যার পর ধূপ-ধূনা জ্বালিয়া, আসন পাতিয়া সুর করিয়া ব্রত কথার বইখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া লক্ষ্মীপূজা শেষ করে। গলবস্ত্র হইয়া আসনের কাছে পাঁচ সাত মিনিট চোখ বুজিয়া থাকে।

পরণে গরদের লালপেড়ে শাড়ী, কপালে জ্বলজ্বলে সিঁদুরের ফোঁটা, এলোচুলে দু একটী ফুল গোঁজা, হাতের আঙ্গুলে চন্দনের দাগ, আয়ত চোখ দুটিতে উদাসী প্রশান্ত দৃষ্টি,—দুটি বিমুগ্ধ চোখে এই তাপসী মূর্ত্তিটিকে অপলক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া নরেন হয় ত কোন দিন হাসিয়া বলে, "আমার কুঁড়েঘরে যখন স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীর আবির্ভাব তখন ঐ ছবির লক্ষ্মী পূজো করে লাভ কি বলো!"

"বুড়ো হ'তে চল্‌লে, এখনো কথার ছিরি ছ্যাখ না!" বলিয়া হাসিয়া সুলতা স্বামীকে প্রসাদ খাইতে দেয়। মাথায় ঠেকাইয়া খাইতে যেদিন ভুল করে নরেন, সেদিন মৃদু-মধুর তিরস্কারও শোনে!

এক রবিবার সুলতা স্বামীকে ধরিয়া বসিল, সে আজ কালীঘাট যাইবে, অনেক দিন হইল কালীদর্শন ঘটে নাই।

কালী গঙ্গায় স্নান সারিয়া কপালে চন্দনের ছাপ পরিয়া ভীড় ঠেলিয়া মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করিয়া বাহিরে আসিতে পাকা এক ঘণ্টা। নরেন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল।

কিন্তু বাহিরে আসিয়াও নিস্তার নাই! মন্দিরের-গায় মাথা ঠেকাইয়া সুলতা মিনিট কয়েক মুখ বিড় বিড় করিয়া কি সব কহিল সে-ই জানে। নরেন এবার সত্যই বিরক্ত হইয়া ওঠে "হয়েছে ত। এবার ওঠ।"

"তোমায় নিয়ে কোথাও এতটুকু শোয়াস্তি নাই। আজ ছুটীর দিনে এ উপকারটা করে তোমার কোন্ ক্ষেতি হচ্ছে শুনি?"

"বেলা ক'টা বাজে সেদিকে খেয়াল আছে? সকালে ত কিছু খেতে দাও নি আজ। বল্‌লাম খেয়ে যাই...না, এসে খাবে।"

সুলতা আঁচলের খুঁট হইতে সন্তর্পণে খুলিয়া স্বামীর হাতে একটী ফুল দিতে গেল, "এই নাও! মাথায় ঠেকিয়ে খেয়ে ফ্যাল —ভক্তি করে খেয়ো কিন্তু।"

নরেন হাসিয়া কহিল, "এ ত আচ্ছা বিপদ! ক্ষিদেয় যাচ্ছে পেট জ্বলে, বলে ফুল চিবোও। চল, বাসায় চল।"

সুলতা জোর করিয়া স্বামীর হাতে ফুলটী গুঁজিয়া দিয়া কহিল, "আমার মাথা খাও,—অগ্রাহ্যি করো না!"

"এ খেয়ে হবে কী?"

সুলতা অনুনয়-মাখানো করুণ কণ্ঠে কহিল, "আমার একটা অনুরোধও কি রাখ্‌তে নেই কোনদিন"

"অনুরোধ পরে রাখব'খন। আগে শুনি, এ খেয়ে লাভ কী? ফুল ত মাথায় ছোঁয়ালেই চলে।"

"কাল রাত্রে আমি স্বপন দেখেছি। তুমি খেয়ে ফ্যাল।"

"কী স্বপন দেখেছ. শুনি?"

"তা তুমি শুনতে পাবে না। শুনলে ফলে না স্বপ্ন।"

"তা হ'লে আমিও খাব না।"

"খাবে না?" বলিয়া সুলতা হতাশ দৃষ্টি মেলিয়া রাস্তার উপরেই বসিয়া পড়িল!

নরেন স্ত্রীর হাত ধরিয়া কহিল, "ক্ষেপেছ!—ওঠ।"

"এই আমি বসলুম। আজ যে বাসায় যায় সে ত্রিলোক চক্কোত্তির মেয়ে নয়।"

নিরুপায় নরেন তাড়াতাড়ি ফুলটা চিবাইয়া গিলিয়া ফেলে।

বাসায় ফিরিয়া সুলতা ভাত দিবার আগে আসন পাতিয়া সম্মুখের মেঝেতে জলের ছিটা দেয়। তারপর হাতের আঙুল দিয়া কি এক চিহ্ন আঁকিয়া থালা আনিতে যায়। নরেন মনে মনে হাসিয়া খাইতে বসে ভাবে, আর একটু বাড়িয়া উঠিলেই সত্যনারায়ণ, তাহাতে ফল না পাইলে বরাবর রাঁচী।

মাস দুই পরে নরেন একদিন কহিল, "যা হবার হয়ে গেছে। তা বলে তোমার গঙ্গাজলকে সাধ না দেওয়াটা কি ভাল দেখায়?"

সুলতা মৌন হইয়া রহিল।

"ধর্ম্ম সাক্ষী করে গঙ্গাজল করেছ বলেই এ-কথা বলছি।"

সুলতা এবার রাগিয়া ওঠে, "তা গঙ্গাজলেরা বুঝবে। তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার!" খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার খোঁচা দেয় "মেয়েছেলের কথার মধ্যে আসতে লজ্জা করে না! সাধ নিয়ে ব্যাটাছেলেকে ত মাথা ঘামাতে দেখিনি কস্মিন কালে! যত সব বাড়াবাড়ি!"

নরেন মহা অপরাধীর মত চুপ করিয়া যায়।

পরদিন সন্ধ্যার সময় সুলতা স্বামীর হাতে পাঁচ টাকার একখানি নোট দিয়া কহিল, "দেখে-শুনে শাড়ী এনো তোমার যা পছন্দ! আমার সেবারের পূজোর কাপড়ের মতো ছাই-ভস্ম এনে হাজির করো না যেন।"

নরেন ত দেখিয়া শুনিয়া অবাক!

পরদিন সুলেখার সাধ। তাহার এক ভাইঝি আসিয়াছে দিন তিনেক হইল। নাম মনোরমা। সুলেখার খালাস না হওয়া পর্য্যন্ত সে এখানেই থাকিবে।

মনোরমা আসিয়া অনুরোধ করিয়া গেল, তবু সুলেখা যায় নাই। ধীরেশও বিস্তর অনুরোধ জানাইল, কোন ফল হইল না। সুলতা খোঁচা দিয়া কহিল, "যাব কেন? আপনার গিন্নির মুখ কি ছুঁচে সেলাই করা, কথা বলতে জানে না? আমি কি রাস্তার ভিখিরী নাকি?"

ধীরেশ স্ত্রীকে যাইয়া তিরস্কার করে। সেও রাগিয়া জবাব দেয় "মনোরমাকে সকালে অপমান করে ফিরিয়ে দিল! কিসের

গুমর এত! আমার বলায় আর মনোরমার বলায় কোন তফাৎ আছে না কি?"

নরেন আজ ওদের ঘরে নিমন্ত্রণ খাইয়া অপিসে গেল। ধীরেশ নিজ হাতে খাবার দিয়া রারবার সুলতাকে খাইবার অনুরোধ জানাইয়া চলিয়া গেল।

সুলতা কিন্তু দুপুরে খাবারগুলি ফেলিয়া দিয়া ঘরের দুয়ার দিল। বিছানায় শুইয়া আছে কিন্তু ঘুম নাই চোখে! সমস্ত দিন কিছু না খাওয়ায় গা-বমি-বমি করিতে থাকে। উঠিয়া বাহিরে গিয়া বার কয়েক বমি করিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া রান্নাঘরে গিয়া ঢোকে।

উনুনের মুখের এক টুকরা পোড়া মাটী মুখে দিয়া খানিকক্ষণ চিবাইয়া হাক্ থু করিয়া ফেলিয়া দিয়া মুখ ধুইয়া আসিল সুলতা। র‍্যাম বলো! এ আবার মানুষে খায়! অথচ সেদিন সে স্পষ্টই দেখিয়াছে, হতভাগী রাক্ষুসী উনুনের পোড়া মাটী দিব্বি আরামে চিবাইয়া খাইয়া ফেলিল। পোড়ারমুখী!

সুলেখা আসন্ন-প্রসবা। ধীরেশ খুব চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। ঝগড়া করিয়া স্ত্রীর মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা যাইবার রোগ আছে।

হাসপাতালে খালাশ হইতে সুলেখার ঘোর আপত্তি! কার কবে এক ছেলে নাকি বদল হইয়াছিল। গল্প শুনিয়া সে হাসপাতালে যাইতে নারাজ! ধীরেশ বিস্তর বুঝাইয়াছে কোন ফল হয় নাই।

রাত্রে নরেন স্ত্রীকে কহিল, "ধীরেশবাবুর বৌএর এই পূর্ণমাস। এ সময় তোমার রাগ করা চলে না, সুলু। তার ভাইঝি ত বয়সে অনেক ছোট। সে কীই বা জানে। এ সময়টায় তোমার কিন্তু খোঁজ-খবর নেওয়া উচিত।"

"দয়কার থাকে তুমিই নাও না।"

"আমি নিলে যদি হ'ত ত নিতাম।"

"তবে চুপ করে থাক।"

নরেন খানিক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "ঝগড়া সবাই করে, তাই বলে তার জের টানলে কি আর চলে!"

"ভাঙ্গা শাঁখা জোড়া লাগেনা আর" বলিয়া সুলতা পাশ ফিরিয়া শোয়। নরেন ভাবিল রাগ হইয়াছে বুঝি হাত ধরিয়া টানিতে গিয়া হাতে লাগে সুলতার ডান হাতের কবজটা।

"এ আবার কবে পরলে গো?"

"আছ দুপুরে। এতক্ষণ তোমার চোখে পড়েনি বুঝি?"

"কে দিল এ মহারত্ন?"

"এক সন্ন্যেসী ঠাকুর এসেছিল আজ দুপুরবেলায়। কী আশ্চর্য্য ক্ষমতা গো!"

"কী বল্‌লে শুনে?"

"আচ্ছা, আমার মনের কথা টের পেল কেমন করে! হেসো না,—তোমাদের ত কোন কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।"

সুলতার ঘরের মধ্যে চোক চালাইয়া অন্য কোন জনপ্রাণী না দেখিয়া সুচতুর হিন্দুস্থানী বাবাজী যদি হাত দেখিয়া তাহার মনের কথাই জানিতে

না পারিবে, তবে বৃথাই সে এতকাল ব্যবসার এই সহজ পথটায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে।

নরেন গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দক্ষিণা নিলে কত?

"তাতে তোমার দরকার?"

"দরকার নিশ্চয়ই আছে। এ দুর্দ্দিনে একটা ভণ্ড সয়তান এসে অমনি করে গালে চড় মেরে টাকা নিয়ে যাবে, এ সহ্য হয় না!"

সুলতা মুখখানি ভার করিয়া কহিল, "ভারী ত একটা টাকা! তার জন্যে কথা গ্যাখ না!"

"তোমার কাছে ভারী না হতে পারে, কিন্তু শ্যামবাজার থেকে বৌবাজার অবধি ঝাঁট দিয়ে এলেও একটা পয়সা মেলে না—জানো?"

"তোমার একটা টাকা খরচ করবার অধিকারও কি আমার নেই?—এমনি কপাল নিয়েই এসেছিলাম!"

"একটা কেন তুমি দশটা টাকা খরচ কর, তাই বলে তোমার পাগলামোর প্রশ্রয় দেওয়া যায় না।"

এবার সুলতার চোখে জল দেখা দেয়। নীরবে আঁচলে চোখ মুছিতে থাকে। নরেন আজ বিস্মিত হয়। স্ত্রীর এ মূর্ত্তি ত সে কোন দিন দেখে নাই,—এ যে সম্পূর্ণ নূতন! চিরদিন কলহ করিয়া কথার দাপটেই সে জয়লাভ করিতে চায়:—বর্ষণ করে সে যত, গর্জ্জন করে তার চেয়ে ঢের বেশী। আজ এ কি রূপান্তর!—করুণ কাতর অসহায় দৃষ্টিখানি তাহার!

অনুতপ্ত নরেনকে আজ মোটেই সাধাসাধি করিতে হইল না। এক খানি

হাত টানিয়া লইতেই অসহায় শিশুর মত সুলতা স্বামীর বুকে মাথাটি রাখিয়া এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

নরেন তাহার এলোচুলে হাত বুলাইতে বুলাইতে দু'চারটী সান্ত্বনার কথা বলিতেই সে স্বামীর বুকে মুখ গুঁজিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার অভিমানী চোখ দুটীর অন্তরালে ব্যর্থতার যে দুঃসহ বেদনা— নরেন তাহার কতটুকুই বা বুঝিতে পারে!

পরদিন সকালে উঠিয়া সুলতা স্থির করিল স্বামীর আদেশ পালন করিবে। ইচ্ছা করিয়াই সে চৌবাচ্চার উপর চাবীছড়া ফেলিয়া রাখিল, কুজোয় জল ধরিতে গিয়া মুখের ঢাকনাটা রাখিয়া আসিল কলতলায়,— যদি কোন ছলে কেহ ডাকিয়া স্মরণ করায়, বা ফিরাইয়া দিতে আসে, তাহাকেই সুলেখার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবে, সেই সুযোগে ভাঙ্গা শাঁখা হয় তো জোড়া লাগিতেও পারে! কিন্তু কেহই আসিল না।

আঁতুড় ঘরে থাকিবার জন্য একটী ঝি আজ সপ্তাহখানেক হয় এখানে থাকে,—কখন কি হয় বলা যায় না ত। বাইরের দিকের ছোট ঘরটাকেই আঁতুড়-ঘর ঠিক করা হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে ধাত্রী আসিয়া সংবাদ লইয়া যায়। বাসা তাহার বেশী দূরে নহে।

আজ দুপুরে সুলেখার প্রসব-ব্যথা আরম্ভ হইল। ধীরেশ অপিসে, মনোরমা চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে।

উপরের ওদের চাকরটাকে দাই ডাকিতে পাঠান হইয়াছে বহুক্ষণ। আধঘণ্টা হইয়া গেল তবু তাহার দেখা নাই। দাই বাড়ী নাই, না, বাড়ী চিনিতেই ভুল করিল?

থাকিয়া থাকিয়া সুলেখার গোঙনি এ-ঘরে সুলতার কাণে আসিয়া পৌছিতে থাকে। সে উঠিয়া একবার দুয়ারের কাছে যায়, আবার ফিরিয়া আসিয়া বিছানায় শোয়, আবার খানিকবাদে উঠিয়া গিয়া দুয়ার খুলিয়া উঁকি মারিয়া দেখে,—মনোরমা ঝিকে কি সব বুঝাইতেছে আকারে ইঙ্গিতে।

মনোরমা উপরের গিন্নীকে ডাকিল,"আপ্‌নাদের ভজুয়া এসেছে মা ?"

"না মা, এলে ত আগে তোমাদের ওখানেই যেত।"

"কী হবে এখন !" মনোরমার কণ্ঠস্বরে দারুণ দুশ্চিন্তা।

"ভেবো না মা, আমি প্রকাশকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। হতভাগার আক্কেল ছাখ ! দাইকে বাড়ী পাস্‌নি ফিরে এসে সেটা জানা। ও হয় ত তার অপেক্ষায় বসে রয়েছে। ওই গলিতেই ত আমাদের দাই টগরমণিও থাকে। প্রকাশকে বলে দেব তোমাদের দাই বাসায় না থাকলে তাকেই না হয় ডেকে আনবে। ভেবো না মা," বলিয়া উপরের গৃহিণী শুধু মৌখিক ভরসা দিয়া পুত্রের সন্ধানে গেলেন।

সুলেখা তখন দুঃসহ ব্যথায় আর্ত্তনাদ সুরু করিয়াছে।

আর বুঝি দেরী নাই। মনোরমা একবার দুয়ার খুলিয়া গলিটার শেষ পর্য্যন্ত তাকাইয়া দেখে, আবার দুয়ার বন্ধ করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসে। পাগলের মত সে এ-ঘর ও-ঘর করিতে লাগিল। হঠাৎ কি ভাবিয়া সুলতার ঘরের কাছে আসিয়া মনোরমা ভীতি-বিহ্বল কণ্ঠে ডাকিল, "কী হবে পিসিমা !"

সুলতা তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়।

"ভয় কি মা ! ভগবান্ ভরসা" বলিয়াই সে ছুটিয়া ঘরের বাহিরে আসে।

মিনিট্ কয়েক বাদে সদ্যোজাত শিশুকণ্ঠে ক্রন্দন ফুটিয়া ওঠে এই মাটীর পৃথিবীর আলো-বাতাসের সর্ব্বপ্রথম স্পর্শ পাইয়া !

সুলেখা মনোরমার কাঁধে মাথা রাখিয়া মৃতপ্রায় পড়িয়া আছে।

সুলতা ঝিকে মুখ নাড়া দেয়, "আরে মর মাগি ! হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে !—বাতাস্ কর,—হাত চালিয়ে ৷"

খানিক বাদে আচ্ছন্নভাব কতকটা কাটাইয়া সুলেখা কাতর চোখদুটী মেলিয়া চাহিয়া দেখে, সুলতার কোলের উপর তাহারই সদ্যোজাত শিশুসন্তান থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে, আর গঙ্গাজল তাহার নিজেরই আঁচল দিয়া নবাগত অতিথির কচি দেহের রক্তচিহ্ন মুছিয়া লইতেছে অতি-যত্নে—সন্তর্পণে।

বহুক্ষণ পরে সুলেখা ক্ষীণকণ্ঠে ধীরে ধীরে ডাকিল, "গঙ্গাজল !"

"মিতিন !"

"তুমি এসেছ ?"

"আস্‌ব না বোন ! আর কি আমার অভিমান সাজে ! এখন তুমি যে ছেলের মা, গঙ্গাজল !"

বাহিরে কড়া নাড়ার শব্দ ' দাই আসিয়াছে।

অকৃতজ্ঞ

গল্পের যবনিকা উঠিল রসা রোডের কলকোলাহলের মধ্যে। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই নূতন দৃশ্যের অবতারণা হয় ভবানীপুরে—ভদ্রপাড়ার মাঝখানেই টিনের চালার এক মাটির ঘরে।

কপাট ঠেলিয়া নায়িকা ঢুকিল ভিতরে।—পিছনে তাহার শিকার—বছর পঁয়ত্রিশেকের এক মূর্ত্তিমান অকালবার্দ্ধক্য!

প্রথামত, বাড়ীটা পতিতালয় নয়। ধর্ম্মত, গৃহস্থ ঘর কওয়াও চলিবে না। বলিলে অবশ্য বলিতে হয়, বাড়ীটা এ-ও নয় তা-ও নয় গোছের একটা কিছু।

মেয়েটি ডাকিল, "আসুন ভেতরে।—না, একটু দাঁড়ান, আগে আলোটা জ্বেলে নিই।"

ততক্ষণে জগদীশ—বীমার দালাল, বিপত্নীক, বেকার জগদীশ ঘরে ঢুকিয়াছে।

দেয়ালের নিবু-নিবু ল্যাম্পটা চড়াইয়া দিতেই জগদীশের চক্ষু স্থির।—ও-কি!

ঘরের একপাশে দেয়ালের গা ঘেঁষিয়া মেঝের উপর একটি বিছানা পাতা। তিন-চার বছরের এক ঘুমন্ত শিশুর পাশে চুপচাপ শুইয়া আছে একটি পক্ষাঘাতের রোগী।

জগদীশের ন যযৌ ন তস্থৌ ভাব টের পাইয়া মেয়েটি তাহার হাত ধরিল, "ও-কি ! ও বিছানায় বসুন।"

জগদীশ একবার চারদিকে চোখ বুলাইয়া নিল। সস্তার শান-বাঁধানো স্যাঁৎসেতে মেঝের উপর অপরিষ্কার বিছানায় ততোধিক অপরিষ্কার একখানি ছেঁড়াখোড়া চাদর ; দু'জোড়া তেলচিটে বালিশ ; আর ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া আছে ঐ পঙ্গু লোকটা—সব মিলিয়া ঘরের মধ্যে যেন দপদপ করে এমন এক করুণ, নিরুপায়, ভাপসা কুশ্রীতা—যে- আবহাওয়া জগদীশের নোংরা লালসার চেয়েও অনেক বেশী জঘন্য।

তবু জগদীশ উঠিল না। ঘরময় দৃষ্টি তার ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে। ঘরটার এক কোনে একটি লক্ষ্মীর আসন পাতা। জলচৌকির উপরে ফ্রেমে-আঁটা দেবী মূর্ত্তির পদতলে দু'চারিটি বাসি ফুল। গঙ্গাজলের ছোট্ট ঘটীর মধ্যে একটা কুরশী ডোবানো। পাশেই মেঝের উপর ঝকঝকে বাসন-কোসন—। হেঁসেল সংক্রান্ত সব কিছুই তক্তপোষের নীচে। মাটির দেয়ালে নোংরা জামা-কাপড়গুলি সযত্নে সাজানো গোছানো পুরানো একটা ব্রাকেটে। লোকটা কেবল ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকায়। শব্দ করে না।

জগদীশ ঐ লোকটার দিক হইতে চোখ ফিরাইয়া মেয়েটিকে প্রশ্ন করিল, "কথা বলতে বুঝি পারে না ?"

"হুঁ" বলিয়া মেয়েটি দুয়ার ভেজাইয়া দিয়া পান সাজিতে বসিল। সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে টিপ, হাতে নোয়া। আশ্চর্য্য নয় এ-পথে অনেকেরই এমন থাকে। তবু জগদীশ প্রশ্ন করিল, "ও কে ?"

মেয়েটি নিরুত্তর।

"কে হয় তোমার ?"

"খোকার বাবা।"

"তোমার স্বামী ?"

মেয়েটি চুপ। ও বিছানা হইতে লোকটা তখনও চাহিয়া আছে—একবার জগদীশের দিকে, আবার মেয়েটির দিকে।—এক অসহায় শূন্য দৃষ্টি!

"কথা শুনতে পায় ?"

"হ্যাঁ"—

"বোঝে ?"

"হুঁ"

"জ্ঞান হারায় নি তা হ'লে ?"

মেয়েটি মাথা নোয়াইয়া ঘাড় নাড়ে।

এবার মেয়েটি পান দিয়া সামনে আসিয়া বসিল। তারপর চোখেমুখে এক ঝলক হাসি ফুটাইবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "কী ভাবছেন ?"

"তোমার নাম কী ?"

"মল্লিকা।"

"জাত ?"

"কায়েত"

"দেশ ?"

"মুর্শিদাবাদ।"

"গ্রামের নাম ?"

"নাই বা শুনলেন," গম্ভীর হইয়া মলিনা জবাব দেয়। হঠাৎ ঐ বিছানায় লোকটা এক অদ্ভুত আওয়াজ করিয়া উঠিল। কথা বলিতে চায়, পারে না। নিষ্ফল আক্রোশে শুধু ছাড়া ছাড়া ধ্বনির তরঙ্গই তুলিল—আ-আ-আ-ই-ই…

মলিনা উঠিয়া গিয়া খিটখিট করিয়া উঠিল, "আজ আবার হ'ল কী তোমার ?"

জবাবে সেই অর্থহীন অদ্ভুত আওয়াজ।

"কী চাও ? বলো না ছাই।—জল দেব, জল ?"

"ও—নো-ও-ও।"

"কী তবে ?—আমায় জ্বালিয়ো না—বলো শিগগির। রোজ রোজ এমন জ্বালাতন ক'রলে কী ক'রে চলবে বলো তো ?"— এবার মেয়েটির স্বর নরম হইয়া আসে। ফিস্‌ফিস্ করিয়া কহিল, "উনি কী মনে করবেন বলো দিকি নি—রেগে চলে যাবেন। তোমায় রোজ রোজ মাথামুণ্ডু কী সব বুঝিয়ে রাখি—আর তক্ষুনি ভুলে যাও।—চুপ করে থাকো।—আর কথা ব'লো না যেন," বলিতে বলিতে এককোণে গুটানো ময়লা পরদাটা টানিয়া ওদিকটা সম্পূর্ণ আড়াল করিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিল।

জগদীশ এবার জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি করে বলো, ও-লোকটা তোমার স্বামী নয়—ওর সঙ্গে একদিন বেরিয়ে এসেছিলে। আর আজ—"

বাধা দিয়া মল্লিকা বলে, "আপনার অন্য কোন কথা থাকে তো বলুন।"

"রাগছ ?"

"না, রাগ করি আর কার ওপর !"

জগদীশ মেয়েটির হাতে একটি টাকা দিয়া কহিল, "এপথে এসেছ কেন?"

এমন ধারা প্রশ্নে আর সেই অভিনবত্ব নাই—হামেশাই শোনে। তবু জবাব দিতে হয়। না দিলে চলে না। এ-পথে একবার যে নামে সর্ব্বক্ষণ অপরের অখুশীর ভয়ে নিজের খুশীর বালাই তার নাই। শরীর ভাল না থাকিলেও, ব্যবসায়ের খাতিরে যতটুকু না বলিলেই নয়, অন্তত ততটুকু—অনিচ্ছাকেও মিষ্টি মোলায়েম করিয়াই বলা চাই যথাসাধ্য অনায়াসে! জগদীশের প্রশ্নের উত্তরে মল্লিকা আজও সেই বাঁধাধরা বুলি আওড়াইল, "এ-পথে না নেমে আর কী করব বলুন?"

"এ পথের বিপদ জানো?"

"জানি।"

"দু'মাস প'ড়ে থাকলে কে খাওয়াবে?"

"ভগবান।"

"ভগবান কাউকে খাওয়ান না।"

মেয়েটি নির্ব্বাক।

"এ বাড়ীতে তোমার মতো আর ক'জন আছে?"

"তিন ঘর।"

"তাদেরও কি তোমার মতো বড় রাস্তা থেকে শিকার ধরে আনতে হয়?"

মল্লিকা বিরক্তি চাপিয়া রাখিয়া উত্তর করিল, "না, বাঁধা লোক আছে।"

"তোমারই বা নেই কেন? বয়সটা না হয় নেই, দেখতে তো নেহাৎ মন্দ নও।"

মল্লিকা ভিতরের ঝাঁঝটা গোপন করিতে মুখ ফিরাইল পরদাটার দিকে। যারা তাকে এ-পথে টানিয়া নামাইয়াছে, আজ সে-পথের প্রধান বাধা তারাই।

"মস্ত বড় ভুল করেছ।"

মেয়েটি তেমনি নীরব।

"বয়স গেলে এ-পথে একটা ঘষা পয়সাও জুটবে না তা নিশ্চয়ই জানো।"

"তখন ঝি-গিরি করব"

"আজ সে সুমতি হ'ল না কেন?"

"আজ যে আমার বয়স আছে!—বাসন যদি বা মাজতে জানি, রাস্তার লোক শাসন করতে তো জানি নে।"

জগদীশ হাসিয়া উঠিল, "তুমি গায় না মাখলে রাস্তার লোক তোমার গায়ে পড়বে কেন?"

"যে বাড়ীতে খাটতে যাব সে বাড়ীরই উৎপাত যদি ঘন ঘন ঘর অবধি ধাওয়া করে, তাকে ঠেকাব ক'দিন?"

"এ তোমার অনুমান।—"

মেয়েটি চুপ করিয়া রহিল। এমনধারা সহানুভূতিসূচক প্রশ্ন শুনিতে শুনিতে ঘেন্না ধরিয়া গিয়াছে।

"তোমার আত্মীয়-স্বজন কেউ ছিল না?"

"তা জেনে আপনার লাভ?"

"আমার আবার লাভ কী!"

মেয়েটি খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "ছিল সবই। আজো আছে। তারাই দিন আনে দিন খায়—"

"তবু, কাজটা কিন্তু ভালো কর নি।"

হঠাৎ মলিনা হাসিয়া ওঠে—"ভাখুন দিকি নি, এতক্ষণ আপনার নামটাও জিগ্‌গেস করা হয় নি,—আপনার নাম ?"

"আমার নাম ?" জগদীশ চটপট জবাব দিল, "আমার নাম অনাদিরঞ্জন সরকার।"

"কোথায় থাকা হয় ?"

"১০৩১বি শ্যামবাজার ষ্টীট।

"চাকুরি করেন ?"

"হুঁ"।

হাসি গোপন করিয়া মল্লিকা আবার কহিল, "যদি মনে কিছু না করেন তো জিগ্‌গেস করি, কতো টাকা মাইনে পান ?"

"দেড়শ।—আমি আপিসের বড় বাবু।"—মলিনাকে মুচকি হাসিতে দেখিয়া অপমানিত জগদীশ উষ্ণ হইয়া উঠিল, "তাই ব'লে ভেবো না, কাল আবার আসব এখানে।"

মল্লিকা তেমনি হাসিয়া কহিল, "মাথার দিব্যি তো আর দিইনি—আর ঠিকানাও জানিনে। লোকে লুকিয়েই আসে, লুকিয়েই যায়।'

"ঠিকানা জানো না মানে ? আমি কি মিথ্যে বললাম ?"

মল্লিকা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, "ভয় নেই। ১০৩১-বি শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে আপনার খোঁজ নিতে যাচ্ছিনে।" আর গেলেও দেখা মিলিবে না, তা জান।

পরদাটা কাহার পায়ে-পায়ে ঘন ঘন নড়ে। মলিনা দেখিয়াও দেখে না। জগদীশের নজর কিন্তু এড়ায় না। পঙ্গু লোকটা, আজ তার

টাকাই মাটি করিয়া দিল।—আহাম্মক! এই দু'টাকার তিন ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ পৌনে এগার আনার মত সে-ও তো অংশ পাইবে। অকৃতজ্ঞ!

"ওকে এখান থেকে সরিয়ে ফেল্‌তে পার না?"

"একটা ঘরেরই ভাড়া দিতে পারিনে—দু'মাস বাকী পড়ে গেছে।"

"সে কথা বলছি নে।—আর কোথাও—"

"কোথায়? কে নেবে ভার?"

"ভার নেবে! লোকের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই!"

খানিক গম্ভীর থাকিয়া মল্লিকা প্রশ্ন করে, "কাউকে মেরে ফেল্‌লে জেলে দেয়, না?"

"তবে কি মেয়ে ব'লে খাতির করবে?"

"বেঁচে যাই। কিন্তু যতদিন না আমার এই ছেলেটা বড় হয়ে উঠে' রাস্তায় ভিক্ষা করতে বেরুতে পারে, ততদিন ওর ভার কে নেবে?"

"কে আবার নেবে?"

মল্লিকা সকৌতুক হাসি গোপন করিয়া কহিল, "বেশ তো! আপনিই ওর ভার নিন না। তা হ'লে কালই আমি—"

"সখ ত্যাখ না।"

"হাঁ রে মল্লিকা"—দুয়ারের ওপিঠে কর্কশ কণ্ঠস্বর।

"যাই দিদি" মলিনা উঠিয়া দুয়ার খুলিল।

বাহির হইতে চাপাচাপা তর্জ্জনগর্জ্জন সুরু হয়, "কাল বললি, আর তুই ঘোরে বেরুবি না—আর আজই—না বাবা, তা হ'লে

তোমার এখানে থাকা চলবে না। এটা ভদ্দনোকের পাড়া।—আমরা তো আর বাজারে নই।"

"না দিদি, আমি একটিবার মোড়ের দোকান থেকে নুন আনতে গেছলুম। হঠাৎ একটা চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।—ওরই বন্ধু গো। এক ছাপাখানায়ই কাজ করত যে।—তিন বছর পরে দেখা।"

ওপিঠের মহিলা খানিক্ষণ মুখ বিড়বিড় করিয়া অবিশ্বাসের ভাব দেখাইয়া চলিয়া গেল।

ফিরিয়া আসিতেই জগদীশ কহিল, "বাইরে না বেরুলে তুমি কী খাবে এই বুদ্ধিটুকু ওর ঘটে নেই?"

"না, মিথ্যে বলে নি তো—এ বাড়ী তো আর—"

"থামো—নাচতে নেমে আবার ঘোমটার বড়াই কেন?"

মল্লিকা এবার ফোঁস করিয়া উঠিল, "আমাদের সে রকম মনে করেছেন নাকি?"

জগদীশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, "মহাভারত! তোমরা সব গঙ্গাজলে-ধোওয়া সতীসাবিত্রী"

"হ্যাঁ, আপনিও রামচন্দ্র নন। রাত্রিবেলা লুকিয়ে অহল্যা উদ্ধারে আসেন নি।"

জগদীশ তার মুখের দিকে একবার ভাল করিয়া তাকাইয়া কহিল, "অ্যাঁ! রামায়ণ-মহাভারতটাও যে জানা আছে দেখ্‌তে পাচ্ছি।"

মল্লিকা একটু মুচকি হাসে।

"বাড়ী ভাড়া বাকী পড়েছে? তাই বুঝি তোমার উপর ওর এত ঝাঁঝ?"

"হুঁ"

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া জগদীশ আবার প্রশ্ন করে, "মাসে কত আয় হয়?"

মল্লিকা বিরক্তি চাপিয়া নিরুত্তর রহিল।

"তোমাকে যদি ওরা সত্যিসত্যি এখানে আর থাকতে না দেয়?'

"হুঁ।

"হুঁ কি! কোথায় যাবে?"

"রাত এখন ক'টা ব্যজে?" হঠাৎ মল্লিকার এই ধরণের ইঙ্গিত জগদীশ বেশ বুঝিতে পারে। কহিল, "ও—তোমার সময় নষ্ট হচ্ছে।—আবার বেরুতে চাও।—কিন্তু ঘরের চেহারা দেখে তো মনে হয়, তোমার একটা রাতের দাম এক টাকার বেশি হ'তে পারে না।"

মল্লিকা কোন জবাব দেয় না।

"থেকে থেকে শিকার ধরতে আনন্দ পাও, না?"

"হ্যাঁ, পাই।—রাত এখন নটা হবে।"

জগদীশ অট্টহাস্য করিয়া ওঠে।

মল্লিকা উঠিয়া বাতিটা একটু কমাইতে গিয়া কহিল, "একটা টাকা দিয়েছেন বলেই না আপনার এত কথার জবাব বকে বকে মুখ ব্যথা হলেও আপত্তি করিনি এতক্ষণ।"

"টাকার কথাটা তুল্‌ছ কেন?"

"তবে কি এখানে প্রেম করতে এসেছেন?"—মল্লিকা স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "থাক্। আর বাজে কথার প্রয়োজন নেই—"

তাহাদের কথার মাঝখানে কখন অলক্ষিতে আবছা অন্ধকারে ঘুমন্ত শিশু জাগিয়া উঠিয়া আসিয়াছে মায়ের কাছে।

মল্লিকা প্রমাদ গনিল।

"ওকি! —হতভাগা ছেলে, তুই এরি মধ্যে উঠে পড়েছিস।—যা, ঘুম্ গে যা।"

জগদীশ সহসা উঠিয়া দাঁড়ায়, "আমি এখন যাই।"

"সে কি! না, বসুন। ও বড় ভাল ছেলে। চুপ ক'রে শুয়ে থাকে। —আজ দুদিন শরীরটা খারাপ কিনা।"

মল্লিকা মনে মনে শঙ্কিত হয়। এমনতর করুণাকেই যে সে ভয় করে বেশী। দয়া বড় স্বল্পায়ু, বড় নিষ্ঠুর—আসিবার আশ্বাস দিয়াই যায়, আর আসে না। লালসা সহজ, লালসা দয়ালু——তাহাকে বাঁধিবার প্রয়োজন হয় না, সে আপনি বাঁধা পড়ে—অন্ততঃ কিছুকাল বেশ দু'পয়সার মুখ দেখা যায় তো বটেই। মল্লিকার অভিজ্ঞতা আছে। আছে বলিয়াই কণ্ঠস্বরে মিনতি মাখাইয়া অনুনয় জানাইল, "আপনি একটু বসুন। ও এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়বে।"

জগদীশের দৃষ্টি এখন মায়ের উপর নয়।

অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া ছেলেটা মুখ তুলিয়া চাহিল। আগন্তুক! এক মুহূর্ত্ত দেখিয়া লইয়া আবার মায়ের বুকে মুখ গুঁজিয়াছে ভয়ে ভয়ে।—এক বিস্মিত, অসহ্য দৃষ্টি। জগদীশের মগজের মধ্যে সমস্ত ঘরটা যেন একপাক ঘুরিয়া লইল গোলাকার পৃথিবীটার মতই। নিবু-নিবু আলোয় বদ্ধ ঘরের আবছা অন্ধকারে একজোড়া শিশু-চোখের অসহায় চাহনি—

"লক্ষ্মী মাণিক আমার! চুপ করে শুয়ে থাকো তো। তুমি না এখন বড় হয়েছ!—একা শুতে জানো, কেমন?"—বলিতে বলিতে মল্লিকা সন্তানকে বুকছাড়া করিয়া পরদার ওপিঠে শোয়াইয়া দিয়া ফিরিয়া আসে।

জগদীশ আবার উঠিয়া দাঁড়ায়।—দু'টি টাকার জোরে পঙ্গু লোকটাকে বহুক্ষণ আগেই সে নস্যাৎ করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু ঐ শিশু চোখের—

"সত্যি চলে যাচ্ছেন?"

"হুঁ, খুশি হয়েছ, না?—তোমার একটা রাত বেঁচে গেল।"

"আর একদিন আসবেন তবে। রাগ করে চলে যাচ্ছেন না তো?—বসুন না। খোকা এখনি ঘুমিয়ে পড়বে—"

কিন্তু খোকা উঠিয়া পড়িয়া আবার মায়ের কাছে আসিয়াছে। মল্লিকার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। জগদীশকে অনুরোধ জানায়, "আর একদিন কিন্তু আসবেন—দাঁড়ান, আলোটা ধরচি।"

এদিকে ছেলেটা কোলে উঠিবার জন্য প্রাণপণ করিতেছে।

মা জিজ্ঞাসা করে, "দয়া করে আর একদিন আসবেন তো?"

দুয়ারের বাহির হইতেই জগদীশ জানায়, "আর একদিন মানে? কালই আসব। তুমি কি নারী-রক্ষা সমিতির চাঁদার খাতা? টাকা'টা যেন অমনি দিলাম!"

বাহিরে আসিয়া জগদীশ কিন্তু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। আর আসিবে না! হয় তো বা আসিবে। এ পথের পথিক সে আজ নূতন নয়।

কিন্তু আজিকার দৃশ্যটা দস্তুর মত অভিনব! তবু শিশু চোখের ঐ করুণ কুশ্রী ভীতিটুকু ফিকা হইতে বোধ হয় বেশী দিন লাগিবে না।

খানিক দূরে গিয়া কি ভাবিয়া জগদীশ আবার ফিরিল। পকেটে আর একটা টাকা আছে। দাতা সাজিবার মনোবৃত্তি তাহার নাই। দুনিয়ায় দানবীরের অভাব কোন কালেই ছিল না। তবু জগদীশ আবার সেই মেটে বাড়ীটায় দোর গোড়ায় আসিয়া দাঁড়ায়।

কড়া নাড়িতেই ভিতর হইতে মল্লিকা সাড়া দিল, "কে?—"

অনুচ্চ কণ্ঠে জগদীশ জানায়, "আমি।"

"কে, দিদি? একটু দাঁড়াও, দোর খুলে দিচ্ছি।"

দুয়ার খুলিতেই স্তিমিত আলোয় জগদীশ মল্লিকার আসল পরিচয় পায় এতক্ষণে। পরণে একখানি ভিজা গামছা—কোলে ছেলেটি মুখ নাড়িতেছে। অদূরে বিছানার কাছে মেঝের উপর ভাতের থালা। স্বামী আর ছেলেকে একসঙ্গে খাওয়াইতে বসিয়াছিল।

চকিতে দুয়ারের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া অসংবৃত মল্লিকা চাপা গলায় ঝাঁঝিয়া ওঠে, "আপনি না ভদ্দলোক! এতরাত্রে দোর ধাক্কাধাক্কি করছেন, পাড়ার লোকে কী ভাববে বলুন তো!"

"এই টাকাটা দিতে এসেছি," বলিয়া জগদীশ চৌকাঠের উপর একটা টাকা রাখিয়া কহিল, "তোমার ছেলেকে একটা জামা কিনে দিও।"

তেমনি বিরক্তি-ভরে মল্লিকা কহিল, "আপনি যান এবার!—এটা ভদ্দলোকের পাড়া।"

জগদীশ ভাবিয়াছিল, এবারও মেয়েটি যাইবার সময় আবার তাহাকে আসিবার অনুরোধ জানাইবে। একটি টাকা এমনি পাইয়া কৃতজ্ঞতা

প্রকাশ করিবে সে নিশ্চয়ই। কিন্তু জগদীশের মুখের উপর মল্লিকা যে সশব্দে দুয়ার ভেজাইয়া দিল।

খানিক আগের সেই মল্লিকা আর নাই!

বাহিরে আসিয়া জগদীশ রাগ করে নিজের উপর। বড় রাস্তার মোড়ে আসিতেই একটি অর্দ্ধনগ্ন ভিখারী হাত পাতিল, "বাবু, একটা পয়সা

জগদীশ হন হন করিয়া ফুটপাত ধরিয়া চলিল। জোয়ার চলিয়া গিয়াছে। প্রতিক্রিয়ার ভাঁটার মুখে এখন টাকা দুটির জন্য মায়া হয়। মনে মনে আর একবার ভাবে—মেয়েটা কি অকৃতজ্ঞ!

বধূ

নূতন বাসায় আসিয়াছি। বাড়ীটি বেশ। ভাড়াও বেশি নয়। দক্ষিণ যদিও একেবারে বন্ধ, পূব-উত্তরে আলো-বাতাসের যথাসম্ভব ব্যবস্থা আছে। তবু গৃহিণীর বাসা পছন্দ হয় নাই। নোটিশ দিয়া রাখিয়াছে, দেখিয়া-শুনিয়া সুবিধামত আর একটি ভাল বাসায় উঠিয়া যাইতে হইবে—দু'মাসের মধ্যেই।

তথাস্তু! কিন্তু ইতিমধ্যেই গৃহিণীর জ্বালায় আমাকে যে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে হইল। কি খুঁতখুঁতে স্বভাব! এ কয়দিন সর্ব্বক্ষণ কেবলি —কলটা ভাঙ্গা, চৌবাচ্চা অত্যন্ত ছোট, রান্নাঘর দূরে, বাড়ীটা ত সেই মান্ধাতার আমলের···ইত্যাদি।

শুনিয়া চুপ করিয়া থাকি। এজমালি সম্পত্তির অসংখ্য ঝামেলা এড়াইবার জন্য এবার সম্পূর্ণ আলাদা বাসা নিয়াছি। সুতরাং ঝাঁঝটা একা আমার উপর দিয়াই যাইতেছে।

সেদিন সকালে শোবার ঘরে বসিয়া আছি। সুনীলা বাহির হইতেই এই বাড়ী সংক্রান্ত কি একটা অভিযোগ করিতে করিতে ঘরে ঢুকিল।

তাহাকে কথা বলিবার সুযোগ না দিয়া কহিলাম, "দেখেছ নীলা ?"

"কী দেখ্‌ব ?"

নিশ্চিন্ত হইলাম। অভিযোগের পালা অন্ততঃ এ-বেলার মত চাপা পড়িল

"ঐ যে"—বলিয়া দেয়ালের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলাম। সুনীলা প্রথমটায় কিছুই দেখিতে পায় নাই।

শোবার ঘরে পূবদিককার জানালার উপরে দেয়ালের গায়ে একটী টিক্‌টিকি মরিয়া আঁটিয়া রহিয়াছিল। কতদিনের কে জানে। আজ তিনদিন সকালে চা খাইবার সময় দেখিয়া আসিতেছি, আর একটি জীবন্ত টিক্‌টিকি ঐ শুষ্ক শীর্ণ ধড়টার চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া খানিকবাদে চলিয়া যায়। ভাবিতে বেশ লাগে।

"ছাখ্‌ছ !"

"কী ?"

"ঐ যে !"

"একটা মরা টিক্‌টিকি—"

"ঐ মড়াটার কাছে আজ ক'দিন ধরে দেখ্‌ছি ঐ জ্যান্ত টিক্‌টিকিটা এসে ঘুরে ফিরে চলে যায়।"

সুনীলা স্বামীর কথায় এবার হাসিয়া ওঠে। কিন্তু পরক্ষণেই কি এক গভীর কথা চিন্তা করিয়া তাহার সকৌতুক আয়ত আঁখি দু'টি কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "মরা টিক্‌টিকিটা ওর স্বামী কি না।— ঘুরে ফিরে শোক জানায়।"

"স্ত্রীও ত হতে পারে।"

"অ্যাঁ! স্ত্রীর জন্যে নাকি এত দরদ!"

"দরদ বুঝি মেয়েদেরই একচেটে ?"

"নিশ্চয়ই ! আজ আমি মরে গেলে দু'মাস যেতে না যেতে আর একটা ঘরে নিয়ে আস্‌বে।"

পাণ্টা জবাব দিলাম, "দু'মাস না হ'ক ছ'মাস, কি ধর এই এক বছর বাদে তোমরাই বা কোন স্বামীধ্যানে স্বামীজ্ঞানে আহারনিদ্রা ছেড়ে রাত-দিন চব্বিশঘণ্টা উন্মাদিনী হ'য়ে কেঁদেই দিন কাটাও ?"

"তা নয় ত কী ?"

টিক্‌ টিক্‌ টিক্‌ ! দু'জনেই আবার দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইল। টিকটিকিটি এবার যাইবার আগে আর একবার শুকনো মৃতদেহটার স্পর্শ লইয়া গেল।

কহিলাম, "তুমি যাই বল না নীলা, জ্যান্ত টিক্‌টিকিটা কিছুতেই মেয়ে নয়।"

"নিশ্চয়ই ও মেয়ে। মেয়ে আমরা যে কোন মেয়ে জাতের ব্যথা দেখলেই বুঝিতে পারি।"

হাসালে।—আচ্ছা ওটা যে পুরুষ নয় মেয়ে তার প্রমাণ ?

"প্রমাণ আবরে কি ! দেখছ না টিক্‌টিকিটা ওখানে অনেকদিন মরে লেগে শুকিয়ে ঝরঝরে হয়ে গেছে। এদ্দিন তোমাদের ব্যাটা-ছেলের আবার টান থাকে নাকি ? তুচ্ছ টিকটিকির জীবনে দু'দিনই ত দু' বছর-গো।"

অতঃপর সুনীলা বুঝাইয়া দিল, যে হেতু টিক্‌টিকিটি এতদিন পরেও এখনো মড়াটার কাছে আসে সে-হেতু ও মড়াটারই বিধবা স্ত্রী। নান্যেব।

হাসিয়া কহিলাম, "এটা যুক্তি হল না নীলা, আমি যদি বলি স্বামীই বৌএর শোকে পাগল হয়ে রোজ রোজ আসে।"

"এক শ'বার নয়।" বলিয়া সুনীলা দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ জানায়।

সেদিন বহুক্ষণ বিতর্কের পর আমি আপোষে মানিয়া লইলাম, বিয়োগবিধুরা টিক্‌টিকি বধূই স্বামীর মৃতদেহের পার্শ্বে আসিয়া মানুষের অবোধ্য ভাষায় টিক্‌টিক করিয়া ব্যথার পূজা নিবেদন করিয়া যায় প্রত্যহ।

প্রত্যহ সকালে নির্দ্দিষ্ট সময়ে টিক্‌টিকিটি আসিয়া হাজির হয়। প্রথমে আসিয়া মরা টিক্‌টিকিটার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, পরে মৃতের শুষ্ক নীরস অধরপ্রান্তে মুখ দিয়া খানিকক্ষণ নিশ্চল নিস্পন্দ হইয়া থাকে, যাইবার আগে আর একবার চারিপাশে ঘুরিয়া, দু' একবার টিক্‌টিক শব্দ করিয়া চলিয়া যায় ধীরে ধীরে। সুনীলাও প্রতিদিন ঐ সময় সরীসৃপ বধূর আগমন প্রত্যাশায় দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া থাকে।

মাঝে মাঝে ছড়িটা দিয়া উহার শোক নিবেদনে বাধা দিবার সঙ্কল্প করি। সুনীলা ঘোর আপত্তি জানায়, "হয়েছে! একটা সামান্য টিক্‌টিকির উপর তোমার ক্ষমতা জাহির না করলেও চলবে।"

"তুমি যে শেষকালটায় টিক্‌টিকি আরশুলার সঙ্গে কুটুম্বিতা পাতাতে বসলে।"

"তাতে তোমার কোন পয়সা খরচ হচ্ছে?"

হাসিয়া কহিলাম, "মেয়ে মানুষ, হৃদয় যন্ত্রের বাষ্পেভরা ফানুষ।"

"আচ্ছা গো, এবার থামো।" বলিয়া সুনীলা আমার হাত থেকে ছড়িখানা কাড়িয়া নিয়া ঘরের এক কোনে রাখিয়া আসে।

আমাদের বিবাহিত জীবনের মধুময় প্রথম বর্ষ চলিতেছে। এখন নানা মতে নানা ছলে সমস্তক্ষণ রঙীন হইয়া থাকিবার সাধনা। তুচ্ছ একটা টিক্‌টিকি সুতরাং খোরাক জুটাইল মন্দ নয়। মনে মনে হাসি, আর নীলা লাগে আরো ভাল। কিন্তু আমার নিছক কল্পনা-বিলাসকে দু'দিনেই স্ত্রী আমার বাস্তবের মর্য্যাদা দিয়া বসিয়া আছে।

প্রতিদিনের এই কল্পনা-জল্পনায় বাদ সাধিল ভৃত্য নটবর। সেদিন ঘর ঝাঁট দিতে গিয়া মরা টিক্‌টিকিটাকেও রাস্তায় ডাষ্টবিনে ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছে।

সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরিয়া স্ত্রীর মুখে দুঃসংবাদটা শুনিলাম। নটবরকে তিরস্কার করিবার উপায় ছিল না। ভৃত্য তাহার কর্ত্তব্যপালনের পরিচয়ই দিয়াছে। মনে মনে শুধু হাসিলাম। সুনীলা কিন্তু রীতিমত রাগিয়াছে। কহিল, "নটবরটার বুদ্ধি দেখেছ!"

"ওর কী দোষ? আরশুলা টিক্‌টিকি মাকড়সার মধ্যে তোমার মত বিরহ-মিলনের উদ্ভট কল্পনা করার পাগলামো তো ঐ মুর্খ নটবরের নেই।"

সুনীলা খুশী হয় না।

হাসিয়া কহিলাম, "কীটপতঙ্গের মধ্যেও যে তুমি প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার আবিষ্কার করতে চলেছ গো।"

সুনীলা গম্ভীর হইয়া কহিল, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ। ওদের জীবনও আমাদেরই মতো। হেসো না। আমাদের মতোই ওদেরও স্বামী-স্ত্রী পুত্র কন্যা সব আছে। আমাদেরই মতো সুখ-দুঃখ বোধও আছে।"

"ঠাট্টা কর আর যাই কর, আমার কিন্তু মনে হয়, ওর স্বামী ওকে খুবই ভালবাসত!"

"ঠিক আমারি মতো।"

"তাই নাকি!"

"তবে?"

"ঐ যদ্দিন আমি আছি মুখে ভালবাসার বুলি আওড়াবে; তারপর···।"

অন্তরালে একটি টিক্‌টিক ডাকে, টিক্ টিক্ টিক্। সুনীলা বলিয়া উঠিল, "সত্য. সত্য, সত্য। দেখলে ত আমার কথা সত্যি কিনা।"

আমি একটু রগড় দেখিবার জন্য কথার মোড় ফিরাইয়া বলিলাম, "আচ্ছা নীলা! তুমি যদি ঐ টিক্‌টিকিটার মতো অমন করে রোজই শ্মশানে গিয়ে ব্যথার পূজা নিবেদন কর তা' হলে আমি আজ, এই এক্ষুনি, মরতে রাজী আছি।"

"কী অলক্ষুণে কথা যে বল।"

"টিক্‌টিকি মরে, আর আমি বুঝি তোমায় রেখে হঠাৎ একদিন···"

"ভাল হবে না কিন্তু," বলিয়া সুনীলা আমার মুখ চাপা দিয়া কথা বন্ধ করে।

পরদিন সকালে আবার যথাসময় টিক্‌টিকি বঁধু আসিয়া হাজির। সুনীলার মমতা-সুন্দর চোখ দুটি দেওয়ালের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে

চাহিয়াছিল। টিক্‌টিকি আজ সারাটা দেয়াল আঁকিয়া বাঁকিয়া বুকে হাঁটিয়া মৃত টিক্‌টিকিটাকে খুঁজিয়া বেড়াইল। নটবরের কৃপায় সে এতক্ষণে কোথায় কে জানে।

টিক্‌টিকি বধূ খানিক স্থির হইয়া থাকে। শেষে দেয়ালের গায়ে শুষ্ক মৃত দেহের যে দাগ বসিয়াছিল তাহারই চারিপাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাথার কাছে আসিয়া থামে। বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটে। তারপর একসময় ধীরে ধীরে চলিয়া যায় দেয়ালের পথে চোখের আড়ালে।

কহিলাম, "কাল থেকে আর আসবে না।"

"নিশ্চয়ই আসবে।"

"যার জন্য আসা সে-ই যখন নেই, তখন আর আসবে কেন বল।

"কেন নয়?—শ্মশানের চিহ্ন তো আছে।"

"মৃতের জন্য যে শোক তাঁরো মৃত্যু আছে জেনো।"

"তোমার ওসব ধোঁয়াটে কথা বুঝি নে। দেয়ালের ঐ চিহ্নটুকু যত দিন মুছে না যাচ্ছে ও হতভাগীকে আসতেই হবে।"

আমি হাসিয়া কহিলাম, "টিক্‌টিকি বধূর তবে সহমরণে যাওয়া উচিত ছিল।"

এবার সুশীলা আবেশে গলিয়া গিয়া আমার কণ্ঠলগ্ন হইয়া প্রশ্ন করিয়া বসিল, "আচ্ছা মরে যে আবার জন্ম নেয়, শাস্ত্রের একথা কি সত্যি?"

কহিলাম, "তা-ই লেখা আছে বটে। ও-সব বুঝি নে। তবে বিশ্বাস করে মেনে নেয় অনেকেই।"

"আচ্ছা, আমি মরে আর এক জন্মে তোমায়ই পাব তো?"

"তোমার শাস্ত্রকাররাই জানেন।"

"আঃ বল না," বলিয়া সুনীলা একটু ঝাঁকানি দেয়, মিষ্টি করিয়া।

"এ'ত আচ্ছা বিপদ! আমি বললেই সেটা সত্যি হবে?"

সুনীলা ঘাড় নাড়ে।

অগত্যা আমি গম্ভীর হইতে চেষ্টা করিয়া কহিলাম, "পরজন্মে তুমি আমায় নিশ্চয়ই পাবে, আমি যদি কুকুর হয়েও জন্মাই তবুও।"

"যাও, তুমি ঠাট্টা করছ।"

এবার আর হাসি গোপন রাখিতে পারি না। বলিলাম, "তবে আমার কাছে জিজ্ঞেস করছ কেন?"

"তুমি কিচ্ছু জান না, মানও না কিচ্ছু।"

"এতক্ষণে বুঝ্‌লে তো? তোমার ঐ টিক্‌টিকি বধূর জন্যে ডাষ্টবিনের শুক্‌নো ঝরঝরে মরা টিক্‌টিকিটা আবার প্রাণিজীবন লাভ করে স্ত্রীর অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসে থাক্‌বে কি না, সে খবর সঠিক জানাবার ক্ষমতা তোমার শাস্ত্রকারদেরও নেই।"

কথা শুনিয়া সুনীলা খুসী হয় না। কাজের অছিলায় উঠিয়া গেল

পরদিন সকালে আবার টিক্‌টিকি বধূ সমাধি চিহ্নের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া, সুনীলার মতে, বৈধব্যের দুঃসহ বেদনা জানাইয়া গেল। সুনীলা সগর্ব্বে বলিয়া উঠিল, "কি গো, বলছিলে না আর আসবে না! দেখলে ত কার কথা সত্যি।"

টিক্‌টিকি বধূ রোজই আসে। এবং রোজই তাহাকে কেন্দ্র করিয়া

এমনি লঘুতরল হাস্য-কৌতুকে আমাদের স্বামী-স্ত্রীর প্রাত্যহিক প্রভাত-খানিও সরস হইয়া ওঠে।

পূজার ছুটীতে সুনীলাকে নিয়া দেশের বাড়ীতে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখি, বাড়ীওয়ালা ঘরগুলি হোয়াইট ওয়াস্ করাইয়াছেন। ভাড়াটের সুখ-সুবিধার প্রতি গৃহস্বামীর খেয়াল আছে দেখিয়া খুসী হইলাম।

কিন্তু সুনীলার টিক্‌টিকি বধূর শেষসম্বল—দেয়ালের সেই দেহের দাগটুকু আর নাই।

সন্ধ্যা বেলা ঘরে ঢুকিতেই সুনীলা সর্ব্বপ্রথমে দেয়ালের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কহিল, "বাড়ীওয়ালার এখনি চুনকাম না করালে কি চলত না?"

"তোমার টিক্‌টিকি বধূর জন্যে বাড়ীওয়ালা তার বাড়ীটাকে নষ্ট হতে দেবেন, তুমি এই বলতে চাও নাকি?"

"দুদিন বাদে চুনকাম করতে বললে না কেন?"

"ভাল রে ভাল! আমি যেন গুণতে জানি। আমি কি করে জানব তিনি চুণকাম করাবেন কি না। আর, আগে জানলেও আমি কিন্তু বারণ করতাম না।"

"কেন?"

"কাব্যিয়ানা করা আর কতকাল ভাল লাগে।"

কথাটা শুনিয়া নীলা আজ খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর কেমন একটু গম্ভীর স্বরে বলিয়া গেল, "এরি মধ্যে টান ফুরলো? বাসি বলে মনে হচ্ছে বুঝি?"

"মানে?"

কোন জবাব না দিয়া সুনীলা আস্তে আস্তে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

পরদিন ভোরে উঠিয়া দেখি, সুনীলা একটা কাঠি দিয়া দেয়ালের গায়ে আন্দাজে স্থান নির্ণয় করিয়া অনুরূপ এক চিহ্ন আঁকিতে ব্যস্ত। ভাবিয়াছিল, বাথরুম হইতে ফিরিতে আমার অনেক দেরী হইবে। ইতিমধ্যে কাজটা সারিয়া ফেলিবে। প্রশ্ন করিলাম, "ও কি হচ্ছে?"

"টিকটিকিটা আবার আসবে।"

"পাগল না ক্ষ্যাপা! চূণকাম হয়েছে আজ ৭।৮ দিন হ'ল। এদ্দিন পরে তোমার এ ফাঁকিতে কোন ফল হবে কি?"

কথা শুনিয়া সুনীলা আজ বেশ একটু ম্রিয়মান হইয়া পড়িল যেন।

পরদিন সকালে তাহার অপেক্ষায় নীলা সারাটা সকাল ঘরে বসিয়াই কাটাইল। টীকটিকিটা কিন্তু আসে না।

একথায় সেকথায় এক সময় টিকটিকি প্রসঙ্গ তুলিয়া আমি কহিলাম, "হয়ত অসুখবিসুখ করেছে। সেরে গেলেই আবার আসবে ও।"

সুনীলা নিরুত্তর।

"নিশ্চয় আসবে সে—দেখে নিও"

তবু সে কথা কহিল না।

টিকটিকিটা আর আসে না। সুনীলা কিন্তু আশা এখনো একেবারে ছাড়ে নাই। সেদিন ঘড়িটার টিক্‌টিক্ শব্দে ভুল করিয়া সে দেয়ালের দিকে চোখ ফিরাইল বড় আশায়। আমার চোখে চোখ পড়িতেই মুচকি হাসিয়া কহিল, "হতভাগীও এদ্দিনে মরে বেঁচে গেছে। নইলে আসত সে নিশ্চয়।"

নাছোড়

পূর্ব্ববঙ্গের একটি সাব্-ডিভিশন টাউন। সহর বলিলে বাড়াইয়া বলা হয়, আবার গ্রাম বলিলেও লোকে আপত্তি জানায়।

কাল সারারাত নাগাড়ে বৃষ্টি পড়িয়াছে। আজ ভোর থেকেও ছেদ নাই। বেলা ন'টা নাগাত এখন একটু থামি-থামি ভাব।

জুনিয়র উকিল ধীরেশ মিত্রের বাসার রান্নাঘরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়ায় একটা রোগা লিকলিকে বিড়ালের বাচ্চা।

গৃহিণী আশালতা স্বামীর ভাত বাড়িতে ব্যস্ত। বিড়ালটি দুয়ারের বাহির হইতে একটুখানি মুখ বাড়াইয়া ডাকিল, "ম্যাঁও!"

গৃহিণী মুখ ফিরাইয়া দেখেন, জলে কাদায় একাকার একটি মূর্ত্তিমান রসভঙ্গ। একবার হাত ঝামটা দিয়া বিড়ালটাকে মুখে মুখে তাড়া করিলেন। কিন্তু নিরুপায় বিড়ালের বাচ্চা নির্ব্বিকার। বার কয়েক গা ঝাড়া দিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া এক কোণে আশ্রয় লয়। বাজারের চুবড়িটার কোল ঘেঁষিয়া মাটিতে দেহ এলাইয়া দিল পরম নিশ্চিন্তে—যেন কাহারো অনুমতির অপেক্ষাই সে রাখে না।

আশালতা দূর হইতে আবার করিল তাড়া। এবার সে স-গোঁফ মুখখানি তুলিয়া অতি করুণ কণ্ঠে একবার ডাকিয়া উঠিল, "মিউ!"

বাহিরে আবার ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি সুরু হয়। বাচ্চাটাকে তাড়া করিতে এবার আশালতার বড় লাগে। অবোলা মার্জ্জার-শিশুর জন্য অবলার প্রাণে দয়া দেখা দেয়।

কিন্তু স্বামী ঘরে ঢুকিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "এ ব্যাটা আবার এল কোত্থেকে?"

"ব্যাটা নয় গো, বেটি।"

"কেমন করে জানলে?"

"তা জানা যায়," বলিয়া স্বামীর অজ্ঞতায় আশালতা হাসিয়া মুখ ফিরায়।

"বেটাই হ'ক আর বেটিই হ'ক, এ আপদ কিন্তু ঘরে জায়গা দিয়ো না।"

"এ জলঝড়ে কোথায় যাবে বলো তো?"

"অত দয়া দেখাতে হবে না। আজ তুমি ঘরে দেবে জায়গা, কাল থেকে সকল গোষ্ঠি মরবে এবার পেটের অসুখে।"

"তোমার যত অনাচ্ছিষ্টি কথা। বেড়াল যেন কারু বাড়িতে থাকে না আর!—আর, তারা সব কেবল পেটের অসুখে ভুগে-ভুগেই মরে?"

বেচারা মার্জ্জার-শিশুর জন্য উকিল স্বামীর কাছে আশালতা যতই ওকালতি করুক না কেন, ধীরেশবাবুর মন ভিজিল না। একটু রাগত ভাবেই যেন কহিলেন, "যে বাড়িতে থাকে থাকুক, এ-বাসায় নয়। হেগে মুতে ঘরদোর বিছানাপত্তর সব একাকার করবে, বুঝবে তখন।"

"তুমি বড় নিষ্ঠুর গো!—দেখ্‌ছ না, বাচ্চাটা শীতে কাঁপছে। তোমার প্রাণে কি একটু মায়াও নেই?"

স্ত্রীর অনুনয়ে দ্বিগুণ অসম্মতি জানাইয়া ধীরেশবাবু জবাব দেয়, "তোমার মায়া দয়া বুঝি বড্ড বেশি হয়ে গেছে,ছেলেপেলেদের দিয়েও আর আশ মিটছে না!—বেড়াল পোষায় কত মজা দুদিনেই টের পাবে।"

আশালতা নিরুত্তর।

"বেড়াল থেকে ডিপথিরিয়া হয় তা জানো?"

আশালতা সে কথা জানে কি না তাহা জানা গেল না।

"জল থেমে গেলে তোমার এই পরম আত্মীয়টিকে না হয় চাট্‌টে-খানিক খাইয়েই বিদায় করে দিয়ো!—এ উৎপাত আমি ঘরে রাখতে দেব না, বলে রাখছি!"

এবারও আশালতা উচ্চবাক্য না করিয়া দুধের বাটি আনিতে উঠিয়া যায়। চুপ করিয়া যাওয়াই জেদ বজায় রাখিবার প্রকৃষ্ট পন্থা।

বিকালে কোর্ট হইতে বাসায় ফিরিয়া ধীরেশবাবু দেখিলেন, বিড়ালের বাচ্চাটা ইতিমধ্যেই তাহার মেজো ছেলের দুধভাতের অর্দ্ধেক অংশীদার বনিয়া গিয়াছে। গৃহ-স্বামীর জুতার ঠোকর খাইয়া সে খাওয়া ফেলিয়া ছুটিয়া পালায়।

এবেলা ধীরেশবাবুর মেজাজ ছিল ভাল—বোধ হয় আজ পকেটে কিছু পড়িয়াছে। তাই সহাস্যে হাঁকিলেন, "আশা, তোমার সকালকার ভিখিরী যে এ-বেলাই একেবারে অধিষ্ঠাত্রী দেবী হয়ে দাঁড়াল।"

"কী করব বলো। হাজারো বার তাড়া করেছি, কিছুতেই যেতে চায় না।"

বিড়ালের বাচ্চা খানিক আগের অমন পাদুকাঘাতের কথাটা ভুলিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। আসিয়াছে তো আসিয়াছে একেবারে গৃহকর্ত্তারই পায়ের কাছে। ধীরেশবাবু বাচ্চাটার পেটের তলায় পা দিয়া ফুটবলের মত আস্তে দাওয়া থেকে ছুঁড়িয়া মারিল উঠানের উপর। ক্যাঁৎ করিয়া বিড়ালটা মাটিতে পড়িয়াই পরক্ষণে আবার সোজা উঠিয়া দাঁড়ায়।

"তুমি যেন কেমন!" বলিয়া আশালতাও রাগ দেখায়।

"যেমনই হই, ওকে বিদায় করে দাও।"

"আমি বুঝি বাচ্চাটাকে ধরে রেখেছি? লাথি মেরে তো দেখ্‌লে, সবুর কর না, খানিক বাদে আবার তোমার কাছেই ফিরে আসবে। ও কি কম নাছোড়বান্দা।"

"একটা লাঠি নিয়ে এসো দিকিনি,কেমন যায় না তা দেখব একবার।"

এবার আশালতা আবদারের ভঙ্গিতে কহিল, "অমন করছ কেন! রইলেই বা। অনেকে তো আদর করেও বেড়াল পোষে—ঘরের আরশুলা মারে, ইঁদুর মারে।"

"শেষকালে বাড়ীশুদ্ধ সবাইকে মারবে," ধীরেশ বাবু অবশ্য হাসিয়াই কহিলেন, "মানুষ পায় না খেতে, আর বেড়াল!"

আশালতা মুখ ভারের ভান করিয়া কহিল, "তোমার সবতাতেই আদিক্যেতা। বেড়াল যেন বনজঙ্গলে গিয়ে বাস করে?—ছেলে মেয়েও তো বেশি থাকে কারু কারু ঘরে!"

"এ ঘরে তাতে কমতি আছে নাকি?"—ধীরেশবাবু কথাটা বলিয়াই

চাপিয়া যাইতে চাহিলেন। এই ধরণের ইঙ্গিতে স্ত্রী মারাত্মক রকমের ত্রুটি নেয়!

আশালতা মনে মনে রাগিয়া গেল অসম্ভব। বিবাহের সাত বছর পার হইতে না হইতেই সে চার ছেলের মা—আর একটিও আসিবার নোটিশ পাঠাইয়াছে। এমন আর কি! ছেলেপেলে বুঝি লোকের বেশি হয়? অমন কথায় যে অমঙ্গল ঘটে!

স্বামীর এই অসঙ্গত ইঙ্গিতের প্রতিবাদে আশালতা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় চৌকাঠের ওপার হইতে ভয়ে ভয়ে ঘরের মধ্যে মুখ বাড়াইয়া বিড়ালটা ডাকিল, "ম্যাঁও।"

ধীরেশবাবু স্ত্রীর অভিমানটা হালকা করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে পিছু ডাকিলেন, "ওগো শুনছ! তোমার মেয়ে ডাকছে।"

বিড়ালের বাচ্চা আবার ডাকিল, "ম্যাঁও, ম্যাঁও!"

"ঐ শোন, মা—ও, মা—ও!"

আশালতার হালকা রাগের ক্ষণস্থায়ী বুদ্বুদ এবার ফাটিয়া গেল। "যাও" বলিয়া মুখ ফিরাইয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া চলিয়া যায়।

বিড়ালটিও আশ্রয়দাত্রীর পায়েপায়ে রান্নাঘরে আসিয়া হাজির।

নাছোড়বান্দা!

মাস খানিক পরের কথা। বিড়ালটি ইতিমধ্যে খাইয়া দাইয়া দিব্বি মোটাসোটা হইয়াছে! রংটিও খুলিয়াছে খাসা—ধবধবে সাদা।

পশমের দেহটি যেন মাখনের মতই মোলায়েম। থপ্ থপ্ করিয়া হাঁটে। আরশুলা টিকটিকির আওয়াজ পাইলে অমনি কাণ খাড়া করে। ইঁদুর দেখিলে তো সাদায়-কালোয় দো-আঁশলা লেজটা ফুলিয়া ওঠে চমৎকার! অন্য বাসার বিড়াল দেখিলে তর্জ্জন-গর্জ্জন সুরু করে—খামচাইয়া কামড়াইয়া তাড়াইয়া দেয় তক্ষুণি। এ বাড়ীতে তারই শুধু একচেটিয়া অধিকার।

আশালতা নাম রাখিয়াছে 'লুসি'। বড় ছেলে বিশুর সে বড় আদরের। চৈত্র সংক্রান্তির মেলায় লুসিকে সে একটা ঘুঙুর কিনিয়া উপহার দিয়াছে। মেজো ছেলে বিনু তো খাইতে খাইতে দুধমাখা ভাতের অর্দ্ধেকেই লুসির জন্য ফেলিয়া যায়। তৃতীয় পুত্র বাচ্চুর মুখে এখনো ভালো করিয়া কথা ফোটে নাই। তবু তাহার একান্ত পীড়াপীড়িতেই নাকি আশালতাকে বাধ্য হইয়া লুসির একটা পোষাকী জামা সেলাই করিয়া দিতে হইয়াছে।

আশালতা প্রায়ই ছেলেদের অনুরোধে লুসিকেও সাবান মাখাইয়া স্নান করায়। রাত্রিবেলা উনুনের পাশে খড় বিছাইয়া রাখে, লুসি আরামে ঘুমায়। এতটা বাড়াবাড়ি দেখিয়া বাড়ীর এতকালের কুকুর টমির রাগ হইবারই কথা—এ-বাড়ীতে সে-ও তো একজন। তাই হঠাৎ টমি সেদিন অতর্কিতে লুসিকে আক্রমণ করিয়া বসিল। আর সে যায় কোথায়! এই মহা অপরাধের শাস্তিস্বরূপ বড় ছেলে বিশু একটা লাঠি লইয়া টমিকে হাইস্কুলের খেলার মাঠ পার করিয়া দিয়া থানার দক্ষিণ দিককার খোলা মাঠ অবধি ধাওয়া করিয়াছিল।

বিকালে আশালতা চুল বাঁধিতে বসে। লুসি আসিয়া পিঠের উপর

ওঠে। বেণীর উপর থাবা মারে, খোঁপা ধরিয়া টান দেয়, না হয় লাল ফিতাটা কামড়ায়, নয় তো বা সিঁদুরের কৌটাটা লইয়া লাফাইয়া লাফাইয়া খেলায় মাতে। সময় নাই, অসময় নাই, নানান ভাবে আশালতাকে সে বিরক্ত করিয়া খুসী রাখে কেবলি। আহ্নিকে বসিলে আসনের উপর কোল ঘেঁষিয়া বসে। প্রথমটায় আশা খুঁত খুঁত করিত, আজকাল সবই তার গা-সওয়া হইয়া গিয়াছে। রাঁধিতে গেলেও লুসির জ্বালায় অস্থির। এটায় ওটায় মুখ দিতে চায়। আশালতা কখনো রাগিয়া যায়, গালি দেয়, তাড়া করে, ঠোনা মারে—কখনো বা হাসিয়া হাসিয়া কোলে তুলিয়া নেয়, আদর করিয়া কত কি বলে, কখনো চুমুও বুঝি খায়।

গৃহকর্ত্তা কোন দিন খুশ-মেজাজে গৃহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ জমাইতে বসিয়াছেন হয় ত। লুসি চেয়ারের তলা হইতে তাঁর কোঁচার খুঁটের সঙ্গে ভাব করিতে থাকে। ধীরেশবাবুর এক এক দিন ভাল লাগে, কোনদিন বা বিরক্ত হইয়া পায়ের ঝাপটায় লুসিকে ডিগবাজি খাওয়াই ছাড়েন। তবু লুসির লজ্জা নাই। পরক্ষণেই আবার স্বামী-স্ত্রীর সরস সংলাপের মাঝখানে আসিয়া পড়ে—আশালতার মাটিতে লুটানো আঁচলের ছাবি ছড়ার উপর বার বার তাহার নখের আর দাঁতের ধার পরীক্ষা করিয়া দেখে। ধীরেশ বাবু হাসিয়া বলেন, "মেয়ে তোমার কী যেন বলতে চায়, শোনই না।"

আশাও পাল্টা জবাব দেয়, "আমার সতীন কিনা! তোমার সঙ্গে কথা বলছি, দেখে মুখপুড়ী হিংসেয় জলে-পুড়ে মরছে।"

পরক্ষণেই লুসিকে দেখা যায় ঘরের আর এক কোণে। চালার

দিক হইতে টিনের বেড়া বাহিয়া নিচে নামিতে নামিতে হঠাৎ একটা টিকটিকি জানালার মাথায় আসিয়া থামিয়া পড়িয়াছে। লুসিও লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে উর্দ্ধমুখে। টিকটিকির আর বেশি দূরে নামা হয় না। লুসির শিকার বড় সেয়ানা—নাগালের বাহিরে। অগত্যা সে রণে ভঙ্গ দেয়। বেচারা কতক্ষণ আর ঠায় দাঁড়াইয়া থাকিবে। ফিরিয়া আসিতে আসিতে মাঝপথে মেঝের উপর নজরে পড়ে ছোট খোকার কাঠের ঝুমঝুমিটা। অমনি সেটা লইয়া ঘরময় এক দুরন্ত খেলা সুরু করিয়া দেয় শ্রীমতী লুসি। দূর হইতে আশালতা দেখে আর হাসে, গৃহকর্ত্তাও অখুশি হন না।

আরও মাস দুই পরে। লুসিকে আর বাচ্চা বলিবে কে! এখন সে দস্তুরমাফিক পূর্ণ যুবতি! সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বরূপও পূর্ণ প্রকটিত হইয়াছে; আস্‌কারা পাইলে কে না মাথায় ওঠে! লুসিকে লইয়া আজকাল রাতদিন মহা ঝঞ্ঝাট। আগে সে পাতের কাছে মাছের কাঁটা চিবাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত। এখন আর শুধু উচ্ছিষ্টেই তার মন ওঠে না। হেঁসেলে ও-বেলাকার ঢাকা-দেওয়া সাঁতলানো মাছের অর্দ্ধাংশ প্রায়ই অদৃশ্য হইয়া যায়। মাঝে মাঝে খোকনের রাত্রিবেলার দুধের বাটিতে বার্লির পরিমাণই বেশি থাকে যেন।

ধীরেশবাবুর আদেশে ভৃত্য ভজহরি বার দুই লুসিকে সহরের বাহিরে রাখিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ঘণ্টা দুই যাইতে না যাইতে আবার লুসি

রান্নাঘরের পিছনে আসিয়া ডাকিতে থাকে—মিউ-মিউ! আশালতার মায়া হয়। ঘরে কন্যারত্নের অভাব ছিল। লুসি যেন সেই শূন্য স্থান পূর্ণ করিয়াছে আর কি!

আশালতা লুসির শত অপরাধ চাপিয়া ঢাকিয়া অনেক কাল চালাইয়াছেন। কিন্তু এবার বুঝি লুসির সত্য-সত্যই কপাল ভাঙ্গে। লুসি এখন সন্তানের মা। অর্দ্ধ ডজন বাচ্চা প্রসব করিয়া আবার সে গৃহকর্ত্তার বিরাগভাজন হইয়াছে।

ধীরেশবাবু একদিন কহিলেন, "আশা, এবার ওটাকে বিদায় করতে হবে। ওর উপরও মা ষষ্ঠীর যে রকম কৃপাদৃষ্টি, দুদিন বাদে আমার মতো গরিব উকিলের বাসায় আর কুলোবে না।"

আশালতা জবাব দেয় না। সুন্দর কচি কচি বাচ্চা কয়টি তখন বারান্দায় খেলা করিতেছিল পরস্পরের সঙ্গে সোহাগের যুদ্ধ বাধাইয়া। ধীরেশবাবু বাচ্চাগুলির দিক হইতে চোখ ফিরাইয়া কহিলেন "বাচ্চাগুলি না হয় থাক, বড় হ'লে একটি রেখে বাকি সব বিলিয়ে দিয়ো! কিন্তু লুসিকে আর রাখা চলবে না।"

"অপরাধ?"

এবার আশালতা মুখ খুলিয়াছে। তার মুখের ভাব স্বাভাবিক নয়। ধীরেশবাবু কিন্তু বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, এই প্রস্তাবের মধ্যে অন্যায়টা কোথায়। ঘরে একটা বিড়ালের প্রয়োজন, বেশ তো—প্লেটের

কাছে পাটকিলে দাগ যেটার সেই সুন্দর বাচ্চাটাই না হয় রাখা যাইবে। বিশেষতঃ, ওটা মাদী নয়, মরদ; ভবিষ্যতের ভাবনা নাই। এমন সুব্যবস্থায় আশার তো সায় দেওয়াই উচিত। আবার কহিলেন, "কালই লুসিকে পার করে দেব!"

আশালতা তেমনি গম্ভীর হইয়া জানায়, "বেশ তো, আমাকে শুদ্ধ পার করে দাও না। নিশ্চিন্ত হয়ে থাক্‌বে।"

শুধু ধীরেশবাবুই নন, আরো কিছুকাল বাদে লুসি একে একে বাড়ীর সকলেরই যেন চক্ষুশূল হইয়া দাঁড়াইল। গৃহকর্ত্তার আদেশে মাই না ছাড়িতেই বাচ্চাগুলিকে এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় বিলাইয়া দেওয়া হইল। ছেলেপেলেরাও লুসিকে আর আদর করে না। আশালতা কারণ খোঁজে। লুসির নখ যদিও ধারালো, সে তো আর কাহাকেও আঁচড়ায় না আগের মত। তবে? আসল কারণ বুঝিতে আশালতার দেরী হয় না। লুসির আর সেদিন নাই! আশালতার আদর-যত্নে পোয়াতি লুসি হৃতস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইয়াছে, শ্রী পায় নাই। গাত্রাবরণের সেই জলুশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে একেবারে।

এখন আর লুসি প্রসূতি নয়, তবু তার বিশেষ বরাদ্দ বজায় আছে। কাঁটার সঙ্গে মাছও থাকে। ভাতের সঙ্গে দুধও পায়। তবু ফল ফলে না। শ্রী আর ফিরে না। শুধু লুসির 'নোলা'ই বাড়িয়া যায় অসম্ভব রকম। তার উপর, বলা নাই কওয়া নাই স্থানে অস্থানে অপরাধ করিয়া বসে। দুর্গন্ধে কর্ত্তার মেজাজ চড়িয়া যায়। চাকর ভজাও আজকাল গৃহিনীর অগোচরে কিলটা চড়টা বসাইয়া দিতে কসুর করে না। সবার কাছেই লুসি এখন দূর-দূর ছাই-ছাই।

লুসির অত্যাচার ক্রমেই বাড়িতে থাকে। অবশেষে একদিন দারুণ এক লজ্জার ব্যাপার ঘটিয়া গেল। সেদিন এক বিশিষ্ট মক্কেল বাসায় আসিলেন। দুধের অভাবে তাঁহাকে চা দিতে পারা গেল না। ধীরেশ বাবু রাগিয়া আগুন।

পরদিনই লুসিকে পোরা হইল বড় একটা থলির মধ্যে। এবার সহর হইতে দু'মাইল দূরের এক মুসলমান মক্কেলের সঙ্গে লুসিকে পার করা হইল। ধীরেশ বাবু বারবার উপদেশ দিলেন, রহিম পুরের চৌ-মাথায় ছালার মুখ খুলিবার আগে সেটা বার কয়েক ঘুরাইয়া ঝাঁকাইয়া পরে যেন বিড়ালটাকে ছাড়া হয়—তবেই সে কোন পথে কোন দিক হইতে আসিয়াছে ঠাওর করিতে পারিবে না।

সারাদিন গৃহিণীর মুখ ভারি। ধীরেশ বাবু আজ বহুদিনের একটা জটিল মোকদ্দমায় জিতিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং সেই আনন্দে আর কোন কিছুর দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নাই। খাইতে বসিয়া স্ত্রীর কাছে সবিস্তারে নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছিলেন, এমন সময় একটা আরশুলা মুখে পুরিয়া লুসি আসিয়া সামনে দাঁড়ায়।

"এ্যাঁ! আপদ এরি মধ্যে ফিরে এসেছে? কখন এল?" ধীরেশ বাবু অবাক হইলেন।

"কি জানি গো কখন।"—আশালতার চোখেমুখে আনন্দের চাপা হাসি।

"বাবা! রহিমপুর কি এখানে! এক ক্রোশ পথ চিনে চিনে আবার এসে হাজির! দুধ-ভাতের লোভ তো বড় কম নয়।"

আশালতা হাসিয়া কহিল, "দুধভাতের লোভে নয় গো—এসেছে সতীনের সঙ্গে কোঁদল করতে।"

ধীরেশ বাবু বুঝিলেন, বিশ্বস্ত মক্কেল নিশ্চয়ই মাঝপথে বিড়ালটাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। ও-আপদ কেহ কি আর নিজের গ্রামে ঢুকিতে দেয়।

লুসি তৎক্ষণে আরশুলাটির জীবলীলা ইতি করিয়া সামনের পা দুটিতে থাবা পাতিয়া এক খাঁটি সুন্দরবনী ভঙ্গিতে বসিয়াছিল—দৃষ্টি তাহার থালার পাশে বাটির মধ্যে বড় পেটির মাছখানার উপর।

ধীরেশ বাবুর আজ মেজাজ ভাল। হাসিয়া কহিলেন, "দেখেছ, কেমন করে বসেছে?—ঠিক যেন বাঘের মাসী। আশা, তোমার মেয়েটি সত্যি দেখতে খাসা।"

"হুঁ, কাল সকালেই আবার থলের মধ্যে পুরবে।"

স্বামী স্ত্রী উভয়েরই অমনোযোগের সুযোগে লুসি বাটি হইতে পেটির মাছখানা মুখে করিয়া দে ছুট—সটান চৌকির নিচে কোনের সেই কাঠের বাক্সটার তলায়। এতটা পথ হাঁটিয়া আসিয়া পরিশ্রম তো বড় কম হয় নাই। ক্ষুধাও পাইয়াছে। শিষ্টতা আর কতক্ষণ বজায় রাখা যায়!

"বড় যে প্রশংসা হচ্ছিল সতীনের! কেমন, জব্দ হলে তো!" বলিয়া আশালতা হাত পাখাখানি লইয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, "দিনের দিন তোর নোলা বেড়ে যাচ্ছে হারামজাদী। দাঁড়া না মজা দেখাচ্ছি।"

আশালতাকে আগাইয়া আসিতে দেখিয়া লুসি ভয়ে ভয়ে চৌকির তলা ছাড়িয়া এক লাফে টেবিলের উপর ওঠে। বলা বাহুল্য, মাছের টুকরা এতক্ষণ তার পেটের মধ্যে। আশালতা আজ অত সহজে ছাড়িবে

না—মুখপোড়া বিড়াল স্বামীকে মাছখানা একটিবার ছুঁইতেও দিল না!

আশালতা হাত-পাখার ডাঁটি উঁচাইয়া টেবিলের দিকে গেল। অগত্যা লুসি টেবিলের উপর থেকে ছোট খোকার দুধের বাটি উল্টাইয়া ফেলিয়া দক্ষিণ দিকের একটা জানালার গরাদের মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া ঝুপ্ করিয়া বাহিরে লাফাইয়া পড়িল।

লুসি এখন নাগালের বাহিরে নিশ্চিন্ত। আশালতা তাকে লক্ষ্য করিয়া শাসাইতে থাকে, "এবার এলে ছাই খেতে দেব।—হতভাগী!"

কিছুকাল ধীরেশবাবু লুসি সম্পর্কে উদাসীন রহিলেন। অর্থাৎ লুসি কোন অপরাধ করিলেও সহজে বাবুর কানে উঠিবার জো নাই। ভজুকে গৃহিণী ভাল করিয়া বুঝাইয়া পড়াইয়া রাখিয়াছেন। বিশু আর বিনুও বাবার কাছে সত্য কথা চাপিয়া যাইবার বেশ শিক্ষা পাইয়াছে।

কিন্তু আবার একদিন গোলযোগের সৃষ্টি হইল! অপরাহ্নে বাসায় ফিরিয়া ধীরেশবাবু বৈঠকখানার ঘর থেকে জোর গলায় হাঁকিলেন "টেবিলের ফুলদানিটা ভাঙ্গল কে?"

আশালতা কাছে গিয়া হাসি গোপন করিয়া কহিল, "আমি!"

"মিথ্যে কথা। কখ্খনো তুমি ভাঙ্গো নি।"

"সত্যি বলছি, আমিই ভেঙ্গেছি। দুপুর বেলা আজ ঘরটা ঝাঁট দিতে গিয়ে টেবিলটায় ধাক্কা লেগে ফুলদানিটা পড়ে গেছে। হাস্‌ছ যে, সত্যিই আমি ফেলে দিয়েছি। আর একটা কিনে নিয়ো।"

"আমার সঙ্গে চালাকি করো না আশা। হতচ্ছাড়া বেড়ালের জন্য বাড়ীতে কিছু থাকবে না আর।"

"ভাল রে ভাল! ভেঙ্গেছি আমি, তুমি খাম্‌কা দোষ দিচ্ছ লুসির! এ বাড়ীতে যা কিছু হবে সবই বুঝি লুসির কাজ?"

"ছাখো, মিথ্যে কথা বলো না।"

"আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, ভজাকে ডেকে জিজ্ঞেস কর না।— কি রে ভজা, আমি যখন......?"

"হয়েছে, আর ন্যাকামো ক'রতে হবে না," বলিয়া ধীরেশবাবু চলিয়া গেলেন নিজের ঘরে।

বস্তুতঃ ফুলদানিটা লুসিও ভাঙ্গে নাই, আশালতাও ফেলিয়া দেয় নাই। টেবিল ঝাড়িবার সময় ভজারই হাত থেকে পড়িয়া গিয়াছে। গৃহিণী অভয় দিয়া বলিয়াছিলেন, তাহার কোন ভয় নাই, মা ভাঙ্গিয়াছেন বলিলেই বাবু আর কিছু বলিবেন না।

সেই ভজারই সম্মুখে বাবুর অমনভাবে রাগিয়া চলিয়া যাওয়ায় আশালতার লজ্জার আর অপমানের অবধি রহিল না।

"হতভাগা বেড়ালের মরণও নেই," বলিয়া আশা মুখ অন্ধকার করিয়া রান্নাঘরে চলিয়া যায়।

পরদিন বিকাল বেলায় ধীরেশবাবু বাসায় ফিরিয়াই ভজাকে ডাকিয়া আদেশ দিলেন, "ভজা, লুসিকে ধরে একটা থলের মধ্যে পুরে রাখ।

জহর আলীকে আস্তে বলেছি, এবার নদীর ওপারে রেখে আসবে।"

কথাটা আশালতার কানে গেল। ঘরের বাহিরে আসিয়া সে গম্ভীরমুখে জানায়, "ভাদ্দরমাসে বেড়াল পার করতে নেই। এ মাসটা থাক, তারপর তাড়িয়ে দিয়ো।"

"কে বলে ভাদ্রমাসে বেড়াল তাড়াতে নেই?"

"বলবে আবার কে! এ যে সবাই জানে।"

"যত সব বাজে ইয়ে। আজ ভাদ্রমাস, কাল পৌষ, পরশু অমাবস্যা, পরদিন মাস-পহেলা; অশ্লেষা, মঘা কত ওজুহাতই তুলবে।—এই ভজা, ঘরে গিয়ে বেড়ালটাকে ......"

আশালতা বাধা দেয়, "ভজা, আজ শনিবারের ভর সন্ধ্যায় আমি কিছুতেই একটা জীবকে ঘর থেকে বিদায় দিতে দেব না, কাল সকালে তোদের মনস্কামনা পূর্ণ করিস্। আমি বাধা দেব না। একটা রাত্রে তোদের দুনিয়া রসাতলে যাবে না। এটা হিঁদুর বাড়ী।"

লুসি দাওয়ার উপর তখন নিশ্চিন্তে চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

ছোট খোকা মায়ের কোলে উঠিবার জন্য আঁচল ধরিয়া টানাটানি করিতেছিল। "এ বালাই আমায় রাতদিন জ্বালিয়ে খেল," বলিয়া আশা নিরপরাধ শিশুর পৃষ্ঠে এক ঘা বসাইয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া রান্নাঘরের দিকে গজ্ গজ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর খোকাকে ঘুম পাড়াইতে আসিয়া আশা দেখিল, বিছানার চাদরের উপর লুসি বমি করিয়া রাখিয়াছে। কাল রাত্রেও সে মশারীর উপর এ জাতীয় আর একটি অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছিল। আজ

সারাদিন ভাল করিয়া রোদ ওঠে নাই। মশারিটা এখনো ঘরের মধ্যে শুকাইতেছে। আজ সারা রাত ছেলেপেলে লইয়া আশালতাকে হাত পাখা নাড়িয়া কাটাইতে হইবে। সারাদিনের ঝঞ্ঝাটের পর এখন আবার এই কাণ্ড দেখিয়া রাগে তাহার সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল। নাঃ, আর পারা যায় না। এ আপদ বিদায় হউক!

আপদ তখনো পরম নিশ্চিন্তে মেঝের উপর তন্দ্রাসুখ উপভোগ করিতেছে।

"ভজা, আলমারীর পেছন থেকে লাঠিটা নিয়ে আয় তো শিগ্‌গির," বলিয়া রুটিবেলা বেলুনিটা লইয়া অতর্কিতে আশালতা লুসির পৃষ্ঠে এক ঘা বসাইয়া দিল।

ম্যাঁও-ওঁ-ওঁ! বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া লুসি চৌকির তলায় ছুটিয়া গেল। ধীরেশবাবু ঘরে ঢুকিয়াই কহিলেন, "হঠাৎ যে রণং দেহি মূর্ত্তি। ব্যাপারখানা কী?"

আশালতা ভজাকে আদেশ দিল, "দুয়ারের কাছে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে থাক্।"

বিপদ বুঝিয়া লুসি আলমারীর মাথায় আশ্রয় লইয়াছে। খোঁচার পর খোঁচা খাইয়াও নড়ে না। আশা কাঠের ভারী চেয়ারটা টানিয়া আনিতেই লুসি এক লাফে নীচে নামে। আবার চৌকির তলায় পালাইতে গিয়া বেলুনীর আর এক ঘা পিঠে পড়িল। নিরুপায় লুসি এবার ঘরের বাহিরে যাওয়াই নিরাপদ মনে করিয়া ভিন্ন দিকে ছুটিল। দুয়ার পার হইবার সময় ভজাও আজ্ঞা পালন করিতে কশুর করিল না।

ধীরেশবাবু হাসিয়া কহিলেন, "আশা, শেষকালে তুমিও মেয়ের ওপর বিরূপ হ'লে।"

আশালতা স্বামীর কথায় ঝাঁঝিয়া উঠিল, "দুটি পায়ে পড়ি তোমার, আর জ্বালিয়ো না।" তার পর ভজার দিকে ফিরিয়া কহিল, "ভজা, কাল সকালেই এই আপদ-বালাইকে খেয়া পার করে ওপারে রেখে আসবি—আর যেন এ-মুখো না হ'তে পারে, কাল সকালেই, শুনছিস্ তো?"

সারারাত লুসি জ্বালাইয়া মারিল। ঘরের চারিদিকে মিউ মিউ করিয়া প্রবেশ পথ খুঁজিয়া বেড়াইল। ভিটার মাটি বারবার নখ দিয়া আঁচড়াইল। চালের ফাঁকে কোন গতিকে ঘরের মধ্যে ঢুকিবার অভিপ্রায়ে বার দুই টিনের বেড়া বাহিয়া উপরে উঠিতে গিয়া পা ফস্‌কাইয়া পড়িয়া গেল। এ-ঘর ও-ঘর রান্নাঘর—সকল দুয়ারই বন্ধ। বুঝিল আজ রাত্রে তার বাহিরেই স্থান।

রাত অনেক। আশালতার চোখে ঘুম নাই। লুসির কান্না আর ভাল লাগে না। ইদানীং এই বিছানারই এক কোণে বিড়ালটাও যে সারারাত ঘুমাইয়া থাকে—কোনদিন আশালতার পায়ের তলায়, কোন দিন বা বড় খোকার কোলের কাছে। একদিন ভুলেও সে কাউকে আঁচড়ায় না—এমনি সে এই সংসারের আর দশ জনের এক জন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আশালতার রাগ পড়িয়া আসিয়াছে। সত্যই তো, ওর কিসের অপরাধ! ডাল কি আর মানুষ যে, অতশত বুঝিবে। সন্ধ্যা থেকেই আকাশ মুখভার করিয়া আছে। শুইতে আসিবার আগে জানালা বন্ধ করিতে যাইয়া আশালতা স্পষ্ট দেখিয়াছে, গতিক বড় ভাল নয়—এখন নামুক,

এই রাত্রির মধ্যেই জোর ঝড়-বৃষ্টি আসিবে। লুসির তখন কি দশা হইবে?

আশালতা চুপি চুপি বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসে। একবার ঘুমন্ত স্বামীর দিকে তাকাইয়া নিশ্চিন্ত হইল। সন্ধ্যারাত্রের অত কাণ্ডের পর এখন ধরা পড়িলে লজ্জার অন্ত থাকিবে না।

লুসি তখন দুয়ারের ঠিক ওপিঠেই দাওয়ার মাটি নখ দিয়া আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে মিউ মিউ করিয়া আবেদন জানাইতেছে পুনঃ পুনঃ। আশালতা সন্তর্পণে কাঠের হুড়কা খুলিতে গিয়া খট করিয়া শব্দ করিয়া বসিল। অমনি ধরনীবাবু উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, "কে?"

আশালতা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সাড়া দেয় না। ধীরেশবাবু কিন্তু উঠিয়া বসিলেন। ইদানীং দেশে সিঁধেল চোরের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। পরশু রাত্রেই এক বাসায় চুরি হইয়া গিয়াছে।

নিবু-নিবু হ্যারিকেনটা চড়াইয়া ধীরেশবাবু কহিলেন, "এ কি! তুমি এখনো শোও নি—এত রাত অবধি জেগে আছ?"

"তুমিই বা কোন্ চোক বুজে বেহুঁস হয়ে আছ?" বলিয়া আশালতা ক্লান্তভাবে খটাশ করিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া আবার ফিরিয়া গেল বিছানায়।

ঘটনাচক্রে পরদিন সকালেই নদীর ওপারের তিন ক্রোশ দূরের এক মুসলমান মক্কেল আসিয়াছে। ঘণ্টাখানিকের মধ্যেই, সে আবার নিজগ্রামে চলিয়া যাইবে। ধীরেশবাবু দেখিলেন, এই সুবর্ণ সুযোগ। একটা বিড়াল লইয়া রোজ রোজ এত ঝামেলা ভাল লাগে না আর।

থলির মধ্যে পুরিবার সময় লুসি বিস্তর আপত্তি জানাইল।

বার বার হাত পা ছুড়িয়া সে অস্থির কাণ্ড করিয়া তুলিল। অবরুদ্ধ বিড়ালের দাপটে থলিটা মেঝের উপরে তিন-চার হাত দূরে সরিয়া গিয়াছে। নিরুপায় লুসির অস্পষ্ট কাটা-কাটা কান্না রান্নাঘরে গৃহিণীর কানেও পৌঁছিল।

আজ আশালতা এতটুকু প্রতিবাদ জানায় না। রান্নাঘরে ভাতের হাঁড়িতে গলা অবধি জল চাপাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। সংসারের উপর তাহার ঘেন্না ধরিয়া গিয়াছে। একটা সামান্য বিড়াল পুষিবার স্বাধীনতা তাহার নাই, কি সুখেই সে ঘর করে!

কুকুরটাও বার কয়েক ঘেউ ঘেউ করিল। আশালতা শুধু রাগে। কুকুরও প্রতিবাদ জানায়, তবু মানুষের মায়া হয় না!

একবার শুধু ভজাকে একান্তে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "লোকটা চলে গেছে?"

"হ্যাঁ মা!—রঞ্জনপুরের চক কি আর এখানে! চারক্রোশ।"

আশালতা মুখ ফিরায়।

সারাদিন সে আজ মুখে কুটাগাছি ছিঁড়িয়া দেয় নাই। যথাসময়ে এ-সংবাদ গৃহকর্ত্তার কর্ণগোচর হইয়াছে। ধীরেশবাবু খাইবার জন্য একবারও অনুরোধ জানাইলেন না। বিশেষতঃ এখন অভিমানের মুখে সাধ্য-সাধনা করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইবে। থাক্, ছদিনেই সব ঠিক হইয়া যাইবে। মানুষের কথাই মানুষ চিরকাল না মনে করিয়া রাখে, আর এ তো সামান্য একটা বিড়াল!

আশালতা দিন কয়েক পরে লুসির কথা ভুলিয়া যাইবে ইহা সুনিশ্চিত। কিন্তু ধীরেশবাবু অত সহজে বিদায় করিয়া দিলেও আশালতা আজই

কেমন করিয়া ভুলিবে. এই অবোধ অবোলা জীব তাহার সকল প্রকার দৌরাত্ম্য দিয়াও এই সংসারের প্রাত্যাহিক জীবনের সঙ্গে, যত তুচ্ছই হউক, একটা সম্বন্ধ সূত্রে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। আজ সন্ধ্যাবেলায় ছেলেদের খাওয়াইবার সময় আশালতার তাই মনে পড়ে লুসিকে। সে হয়ত এ-বাড়ী হইতে তাড়া খাইয়া ও-বাড়ী যাইতেছে। এ-পাড়া হইতে বিমুখ হইয়া অন্য পাড়ায় আশ্রয় খুঁজিতে চলিয়াছে। রাত্রি বেলা হয় তো কোন গৃহস্থের কুঁড়ে ঘরের চারিপাশে 'মিউ মিউ' করিয়া প্রবেশের অনুমতি চাহিয়া বেড়াইতেছে। দুধভাতের ভাগ পাইত যে প্রত্যহ, সে বুঝি আজ এক দরিদ্র কৃষকের ঘরে চিবানো ডাটা ক্ষুধার জ্বালায় খাইতে গিয়া অমনি মুখ ফিরাইয়া লইতেছে!

বিনু সুধাইল. "মা, লুসি আর আসবে না?"

মাতা নিরুত্তর।

ছেলে আবার প্রশ্ন করে, "লুসিকে বাবা তাড়িয়ে দিল কেন?"

মা তবু কথা কয় না। পুত্র এবার বুদ্ধি খরচ করিয়া কহিল, "তোমার উপর রাগ করে বাবা লুসিকে তাড়িয়ে দিয়েছে, না মা?"

এবার জননী রাগিয়া উঠিলেন, "খাবি তো খেয়ে নে, না খাবি উঠে যা।—কেবল বক্ বক করতেই শিখেছিস্।"

সারাদিন স্বামীর সঙ্গে আশালতার কোন বাক্যালাপ হয় নাই। দু'বেলাই ধীরেশ বাবুর খাওয়ার সময় স্ত্রী নির্ব্বাক ছায়াচিত্রের অভিনয়ের মত ভাতের থালা, মাছের বাটি, জলের গ্লাস যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিয়াছে নিঃশব্দে। আজ আর কেহ হাত পাখা লইয়া সামনে বসে নাই।

রাত্রে শুইবার সময়ও তেমনি নির্ব্বাক অভিনয়। ধীরেশ বাবু মনে

মনে হাসিলেন—একটু করুণাও জাগে না। অন্ততঃ একটা দিন স্ত্রীর এই হাস্যকর বাড়াবাড়ি খুবই স্বাভাবিক। শত হইলেও বিড়ালটা এতদিন এই সংসারের খাইয়াই না বড় হইয়া উঠিয়াছিল। যাক্, কাল সকালেই আশালতার উদ্ভট মমতা অনেকখানি হালকা হইয়া আসিবে! একটা বিড়ালকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহার গৃহিণীর অধিকারের উপর যে অযথা হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে সেই অভিমানটাই বোধ হয় আসল কথা।

ধীরেশ বাবু অন্ধকারেই স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "বিড়াল থেকে ডিপথিরিয়া রোগ হয়—মা হয়ে ছেলেপেলের কথা তোমার ভুললে চলবে কেন।"

আশালত জবাব দিল না। জাগিয়া আছে কি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে বোঝা যায় না।

মাঝরাত্রে ধীরেশ বাবু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া ডাকিলেন, "আশা, শিগ্গির ওঠ।"

"রাত দুপুরে অমন চেঁচাচ্ছ কেন?"

"আমায় কিসে কামড় দিয়েছে।"

আশালতা তাড়াতাড়ি মশারীর বাহিরে গিয়া আলো লইয়া আসিল। স্তিমিত শিখাটি বাড়াইতেই ধীরেশ বাবু নির্ব্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন। বিছানার এক কোণে কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া আছে লুসি। চাহিয়া আছে করুণ চোখে।

এবার আশালতাও লুসিকে দেখিতে পাইয়াছে। মুচকি হাসিয়া কহিল, "এঁ্যা, হতভাগী তুই কখন এলি?"

"উঃ, বেটি তিন ক্রোশ পথ একদিনে হেঁটে এসেছে!"

আশালতা হাসিয়া কহিল, "তাই রাত দুপুরে অমন ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ!"

"চেঁচাব না? শোন তোমার হতচ্ছাড়া লুসির কীর্ত্তি।--ঘুমের চোখে ভাবলাম, তোমারই হাতখানা......সরে যাচ্ছ মনে করে যেই না দিয়েছি সামনে টান..... এই ছাখো, হাতের কব্জিতে আঁচড়ে রক্ত বার করে দিয়েছে।"

আশালতা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে একবার পড়ে স্বামীর গায়, আবার পড়ে পাশ বালিশটার উপর। হাসি যেন আর থামিবে না।

ধীরেশ বাবুও হাসিয়া কহিলেন, "যত খুশি পরে হেসো—আগে তোমার গুণধর মেয়েকে মশারির বাইরে রেখে এসো।"

"মেয়ে নয় গো, ও আমার সতীন—ভাগ বসাতে এসেছে" বলিয়া হাসিতে হাসিতে আশালতা বিড়ালটাকে বাহির করিয়া দিয়া মশারির প্রান্ত ভাল করিয়া গুঁজিয়া লইল।

লুসি চৌকির তলা থেকে একবার ডাকিয়া উঠিল—ম্যাঁ-ও!